সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

সপ্তম ও অষ্টম সংস্করণ, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০২৩ ■ ৫১তম বর্ষ ■ মূল্য ২ টাকা

ন্যাশনাল কাউন্সিল সভার আহ্বান

ঐক্য আরও মজবুত করে নামতে হবে বৃহত্তর সংগ্রামে

প্রকাশ্য সমাবেশ

জাতীয় কাউন্সিল, উদ্বোধনী মিছিল

বিগত ২৮শে ডিসেম্বর ২০২৩, কলকাতার সল্টলেকে বর্ণময় উদ্বোধন হল

সাংসদ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য

তিনদিন ব্যাপী সর্বভারতীয় রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন (AISGEF)-এর জাতীয় কাউন্সিল সভার। সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত ৫৩৭ জন প্রতিনিধি, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং পঞ্চায়েত যৌথ কমিটির যুগ্ম ব্যবস্থাপনায় যে শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়েছিল

দেবব্রত রায়

তার সদস্যরা, অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সমিতির নেতৃত্ব সহ সদস্যরা এবং গণতন্ত্রপ্রিয় সাধারণ মানুষের এক দৃপ্ত মিছিলের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন হল এই সভার। সকাল ঠিক ৯.৩০ মিনিটে সল্টলেকের যুব আবাস, যেখানে প্রতিনিধিদের আবাসস্থল হয়েছিল তার ২৪নং র‍্যাম্পের সামনে থেকে শুরু হয় এই মিছিল। পুরোভাগে ছিলেন লম্বা লাল পতাকা হাতে সংগঠনের মহিলা সদস্যরা। পাশাপাশি অজস্র লাল পতাকা নিয়ে হেঁটেছেন পুরুষ সদস্যরাও। তার পিছনে AISGEF-এর সাদা পতাকা হাতে নিয়ে সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সর্বভারতীয় সভাপতি সুভাষ লাম্বা,

ডাঃ ফুয়াদ হালিম

সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা AISGEF-এর সহ-সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, পঞ্চায়েত

সুতপা হাজরা

যৌথ কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা AISGEF-এর অপর সহ-সম্পাদক সন্দীপ রায় সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মিছিলে আগুয়ান হলেন। তার পিছনে নিজ নিজ সংগঠনের পতাকা হাতে নিয়ে বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরা এবং অন্য সকলে। সল্টলেক স্টেডিয়াম থেকে পূর্বভারতীয় আঞ্চলিক সংস্কৃতি কেন্দ্র (EZCC) পর্যন্ত প্রসারিত এই মিছিলের পথ সংগঠনের

মিনাক্ষী মুখার্জী

পতাকা, চেন ফ্ল্যাগ দিয়ে সুসজ্জিত করে তুলেছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির লবনহ্রদ অঞ্চলের কর্মী-সদস্য বন্ধুরা। মিছিল যত এগিয়েছে ততই শানিত হয়েছে স্লোগানের কণ্ঠস্বর। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় স্লোগান উঠেছে 'ইনকিলাব

এ. শ্রীকুমার

জিন্দাবাদ', 'আওয়াজ দো—হাম সব এক হ্যায়', 'Up Up Socialism, Down Down

স্মরজিৎ রায় চৌধুরী

Capitalism', 'আমাদের সংগ্রাম

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

রাজ্য কাউন্সিল সভার আহ্বান

১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ মার্চ চার দফা দাবিতে পাহাড় থেকে সাগর অধিকার যাত্রা এবং ১৪ মার্চ, ২০২৪ নবান্ন অভিযান সফল করুন

বিগত ১০ জানুয়ারি ২০২৪ জরুরি ভিত্তিতে ভার্চুয়াল রাজ্য কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় প্রারম্ভিক প্রস্তাব পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। প্রস্তাবনার উপর জেলাগুলি আলোচনা করার পর জবাবী বক্তব্য পেশ করেন যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়। এই রাজ্য কাউন্সিল সভার মধ্য দিয়ে সর্বসম্মতভাবে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়।

১। আগামী ২৬ জানুয়ারি, ২০২৪ দেশের 'প্রজাতন্ত্র দিবস'-এ দেশের সংবিধান এবং তার মর্মবস্তুকে অক্ষুণ্ণ রাখার সাবর্থে বেলা ১২টায় রাজ্যের প্রতিটি জেলা সদরে মানব বন্ধন ও সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ ও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে হবে। কলকাতায় কেন্দ্রীয়ভাবে একই সময়ে মৌলালী মোড়ে কর্মসূচী রূপায়ন করা হবে।

২। বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সলিল চৌধুরী ও মৃণাল সেন জন্ম শতবর্ষ পালন করতে হবে।

৩। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির গঠনপর্বে কর্মচারী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতৃত্ব কমরেড অরবিন্দ ঘোষ ও কমরেড শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য জন্ম শতবর্ষ প্রতিপালনের কর্মসূচী আগামী মার্চ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

৪। গণস্বাক্ষর সম্বলিত প্রস্তাবনার কপি দ্রুত কেন্দ্রীয় দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

৫। পাহাড় থেকে সাগর অধিকার যাত্রা—আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ থেকে শুরু হয়ে ১৪ মার্চ নবান্নে সমাপ্ত হবে। এই অধিকার যাত্রায় মূলত জেলা সদর / মহকুমা ও যে পথে জেলার ব্লক আছে সেই পথ দিয়ে যাবে, জেলায় জেলায় জেলাগত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি জেলার

ওপর দিয়ে যখন 'অধিকার যাত্রা' যাবে, তখন সেই জেলার কর্মচারী ও নেতৃত্বকে মিছিলে যুক্ত করতে হবে। প্রতি জেলাকে জেলাগত ট্যাবলোর ব্যবস্থা করতে হবে। কেন্দ্রীয়ভাবে বাস থাকবে।

৬। অধিকার যাত্রায় জেলার ন্যূনতম ৫০০ জনকে জেলার

● এগারো পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

অধিকার কে কাকে দেয়...
অধিকার লড়ে নিতে হয়

'অধিকার'—চার অক্ষরের ছোট একটা শব্দ। কিন্তু গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। অধিকার ছাড়া আধুনিক রাষ্ট্রভাবনা অমূলক। কারণ আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল 'প্রজা' নামে পরিচিত অধিকারহীন জনগোষ্ঠীর অধিকারসম্পন্ন নাগরিকে রূপান্তর। যার সূচনা হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে নবজাগরণের হাত ধরে। অবশ্য অধিকারের সাথে সাথে রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের 'কর্তব্য'-এর ধারণাটিও বিকশিত হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বহুমাত্রিক অধিকারের ধারণা আত্মপ্রকাশ করেছে। সাধারণ মানুষ অর্জন করেছেনও বহুবিধ অধিকার সারা বিশ্বজুড়েই। বহুবিধ অধিকারের সর্বোন্নত রূপ প্রত্যক্ষ করা গেছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই।

কিন্তু কোনো অধিকারই যেমন বিনা সংগ্রামে শুধু চেয়ে পাওয়া যায় নি, তেমনই অর্জিত অধিকার ধরে রাখার জন্যও প্রয়োজন ধারাবাহিক সংগ্রাম। কখনও কখনও বিশেষ পরিস্থিতিতে অর্জিত অধিকার রক্ষা করার প্রয়োজনটাই সামনে এসে পড়ে।

আমাদের দেশে ২০১৪-র পরবর্তী সময়ে শুরু হয়েছে অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়ার পর্ব। মূল উদ্যোক্তা দিল্লি, পিছিয়ে নেই নবান্নও।

এই কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে, সঙ্কটের বোঝা চাপাও জনগণের ঘাড়ে। মুষ্টিমেয় থাকুক দুধেভাতে। সঙ্কটের বিপুল বোঝার ভারে ন্যুব্জ জনগণ অধিকারের লাঠিতে ভর করে যাতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারে, তার জন্য ঐ লাঠিগুলো কেড়ে নাও। হিংসা-দুর্নীতি আর মিথ্যাচারের ত্র্যহস্পর্শে অতিষ্ঠ করে তোলো সাধারণের জীবন। ঠিক এমনটাই চলছে সারা দেশে, আমাদের রাজ্যে। স্বৈরতন্ত্র, ফ্যাসিবাদী প্রবণতা প্রভৃতি যে নামেই ডাকা হোক না কেন, মোদ্দা কথা রাষ্ট্রীয় পীড়নের বুলডোজারে ভাঙছে জনগণের আকাঙ্খার মেরুদণ্ড।

তাই রুখে দাঁড়ানো দরকার। ইতিহাসের চাকাকে পিছন দিকে ঘোরানোর এই মতলবকে থামাতে না পারলে সমূহ বিপদ সমাসন্ন। এই কারণেই 'অধিকার যাত্রা'-র ডাক দিয়েছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। পাহাড় থেকে সাগর 'অধিকার যাত্রা' মাথা উঁচু করে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় অধিকার রক্ষা করার ডাক পাঠাবে গ্রাম-নগর-মাঠ-পাথার-বন্দরে। কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ আক্রমণে বিপন্ন অধিকার সমূহকে জান কবুল লড়াই করে রক্ষা করতে পারলেই অটুট থাকবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, বহুত্ববাদী ইমারতটি। পশ্চিমবাংলায় ফিরে আসবে একদা গর্বের গণতান্ত্রিক সম্প্রীতির বাতাবরণ। তাই 'অধিকার যাত্রা' দেশ বাঁচানোর লড়াই, দেশপ্রেমিকের কর্তব্য। আপনিও আসুন। □

২৬ জানুয়ারি '২৪ কলকাতায় সংবিধান রক্ষার শপথ নিয়ে মৌলালী মোড়ে মানব বন্ধন

সম্পাদকীয়

৩৭০ ধারা বাতিল প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং কিছু প্রশ্ন

সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে দু'ভাগ করে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে (জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ) পরিণত করাকে সুপ্রিম কোর্ট তার সাম্প্রতিক রায়ে বৈধতা দিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উপর্যুপরি দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় এসে মোদি সরকার ৫ আগস্ট ২০১৯ সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করে জম্মু কাশ্মীরের রাজ্য মর্যাদা কেড়ে নিয়ে এবং রাজ্যকে ভাগ করে জম্মু ও কাশ্মীর ও লাদাখ এই দুই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করে। এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সর্বোচ্চ আদালতে মামলা হয়। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ প্রায় সাড়ে চার বছর পর তার রায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তকে বৈধতা দিয়েছে। এই রায় নিয়ে সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ মহলে যথেষ্ট বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। মনে করা হচ্ছে এই রায় দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, যেটা আমাদের সংবিধানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বৈশিষ্ট্য, তার উপর গুরুতর প্রভাব ফেলবে। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে ঘিরে নানাধরনের প্রশ্ন উঠে আসছে।

৩৭০ ধারা বাতিল সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির আদেশনামাকে বজায় রেখে মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের এই রায় জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতভুক্তির সময় সেখানকার মানুষকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

রায়ে বলা হয়েছে ৩৭০ ধারা একটি সাময়িক ধারা এবং ভারতে অন্তর্ভুক্তির চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর জম্মু ও কাশ্মীরের আর অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব থাকে না। কিন্তু সংবিধান বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন তুলেছেন যে জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রসঙ্গটা কি নিঃশর্ত ছিল? তা তো নয়, বরং ৩৭০ ধারায় এক-দুই করে সেই শর্তগুলি বর্ণিত আছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ মূল প্রসঙ্গে একমত হলেও প্রধান বিচারপতি সহ তিন সদস্য একটি রায় দিয়েছেন। অপর দুই সদস্য আলাদা করে দুটি রায় দিয়েছেন। প্রধান বিচারপতির রায়ে বলা হয়েছে সংবিধানের ৩৭০ ধারা জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার জন্য নয় বরং সাংবিধানিক একীকরণের জন্য বেশি জরুরি ছিল। আরও বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৩৭০(১) ধারা বারে বারে প্রয়োগের মধ্য দিয়েই এই একীকরণের প্রয়াস জারি ছিল। কিন্তু ৩৭০ ধারার ইতিহাস বলছে যে ধারাবাহিকভাবে এই ধারার অপপ্রয়োগ হয়েছে এবং জম্মু ও কাশ্মীরের স্বায়ত্ত শাসনের উপর আক্রমণ নেমে এসেছে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঐ ধারার ক্রমাগত প্রয়োগের মধ্য দিয়ে।

রায়ে ঘোষণা করা হয়েছে যে জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতোই, তাই এই রাজ্যকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার প্রশ্ন আসে না। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন এটা যে উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলি সহ আরও কয়েকটি রাজ্যে ৩৭১ ধারা বলে যে বিশেষ অধিকার ও স্বাতন্ত্র ভোগ করে তার কী হবে?

জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্য মর্যাদা কেড়ে নেওয়া এবং একে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করার মতো গুরুতর বিষয়কে রায়ে কার্যত এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রায়ে কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেলের রাজ্য মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু ৫ আগস্ট ২০১৯-র পূর্বের জম্মু ও কাশ্মীর থেকে লাদাখের অংশ বাদ দিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি হয়েছে। তাহলে রাজ্যের মর্যাদা ফিরে যদি পায়ও তা খণ্ডিত জম্মু ও কাশ্মীর হবে, অখণ্ড নয়। জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সময় সীমা ধার্য করা হয়েছে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪। এত বেশি সময় দেওয়ার ব্যাখ্যা নেই? এর মধ্য দিয়ে অকারণে দীর্ঘ সময় জম্মু ও কাশ্মীরকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাখার কার্যত আইনী স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

অত্যন্ত তাৎপর্যকারী একটি প্রসঙ্গ রায়ে অবহেলিত থেকেছে। ৩৭০ ধারা বাতিল এবং জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্য মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার সময় রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি ছিল, বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির বকলমে তাঁর নিযুক্ত রাজ্যপাল কর্তৃক একটি রাজ্যের রাজ্য মর্যাদা কেড়ে শুধু নেওয়া হল না, রাজ্যের মানচিত্র বদল করে, তাকে টুকরো করা হল। এরকমটা তো অন্য যে কোনো রাজ্যের ক্ষেত্রে হতে পারে! সংবিধানের ৩নং ধারায় বলা আছে যে রাজ্য পুনর্গঠন সংক্রান্ত বিল রাষ্ট্রপতিকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আইনসভার মতামত গ্রহণের জন্য পাঠাতে হবে। এই ধারাকে জম্মু ও কাশ্মীরে অমান্য করা হল কেন—এই প্রসঙ্গে পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেয়নি। এর মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য প্যান্ডোরার বাক্স খুলে দেওয়া হল না কি? বিশেষ করে বর্তমান কেন্দ্রের সরকারের যে ধরনের স্বৈরাচারী মনোভাব দেখা যাচ্ছে তাতে অন্য কোনো বিরোধী শাসিত রাজ্য এই ধরনের আক্রমণের মুখোমুখি হবে না এই গ্যারান্টি দেওয়া যায় কি? সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এই বিষয়ের মধ্য দিয়ে আক্রমণের মুখে পড়ার সম্ভাবনা। বিজেপি-আর এস এস ভারতকে ইউনিটারি স্টেট-এ পরিণত করতে চায়। স্বাভাবিকভাবেই এই রায় ওদের উৎসাহিত করবে।

বিগত ১১ ডিসেম্বর ২০২৩ মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতের এই সংক্রান্ত রায়ের মাধ্যমে তিনটি বিষয় মান্যতা পেয়েছে। সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করা বৈধ, জম্মু ও কাশ্মীরকে টুকরো করা এবং এর রাজ্যের মর্যাদা কেড়ে নেওয়া অসঙ্গত নয়। এই রায় প্রসঙ্গে স্বনামধন্য আইনজীবী ফলি সাম নরিম্যান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, এই রায় 'রাজনৈতিকভাবে গ্রহণীয় হতে পারে, কিন্তু সংবিধানগত ভাবে সঠিক নয়'।

রায়ে ৩৭০ ধারার ক্ষেত্রে 'Temporary' বা 'সাময়িক' শব্দটার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রধান বিচারপতির রায়ে ৩৭০ ধারায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করে কোন অবস্থায় ১৯৫০ সালে সংবিধানে ২১ নম্বর অংশে ৩৭০ ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বলা হয়েছে। কিন্তু রায়ে ওই ২১ নম্বর অংশে অন্যান্য সাময়িক ধারাগুলি কয়েক বছরের জন্য চালু থাকলেও কেন ৩৭০ ধারা ২০১৯ সাল অবধি চালু ছিল তার ব্যাখ্যায় যায়নি। কেন ৩৭৯ থেকে ৩৯১ ধারা, যেগুলি সবই সাময়িক ছিল, সেইসব ধারাগুলি ১৯৫৬ সালে সংবিধানের সপ্তম সংশোধনীর মধ্য দিয়ে বিলুপ্ত হল, অথচ ৩৭০ ধারা বহাল থাকল? কারণ ৩৭০ ধারা ঐতিহাসিক কিছু কারণেই সামান্য কিছু সময়ের জন্য লাগু হয়নি সংবিধানে। ৩৭০ ধারায় বলা আছে এই ধারা সংশোধন বা রদ করতে হলে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির সুপারিশ লাগবে। ১৯৫৭ সালে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি উঠে গেল, কিন্তু ৩৭০ ধারা রায়ে গেল। ৩৭০ ধারার বিবরণ অনুযায়ী এই ধারা তাহলে স্থায়ী হয়ে গেল এমনটা ব্যাখ্যা করাও ভুল হবে না। উত্তর সর্বোপরি ৩৬৮ ধারা বলে সংবিধান সংশোধন না করে এই ধারা করা যায় কী করে?

৩৭০ ধারা বাতিল এবং জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ভাগ ও রাজ্যের মর্যাদা কেড়ে নেওয়াকে মান্যতা দেওয়া এই রায় এইরকম নানা ধোঁয়াশা ও বিতর্ক সৃষ্টি করেছে বিশেষজ্ঞ মহলে। আমাদের সংবিধানের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সেটা পরোক্ষে আক্রান্ত হয়েছে এর মধ্য দিয়ে। তাই দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়কে মান্যতা দিয়েই বলতে হচ্ছে এই রায়ের প্রভাব সুদূর প্রসারী। □

৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

শোক সংবাদ

পার্থ গোস্বামী

রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উত্তর ২৪ পরগনা জেলার প্রাক্তন সম্পাদক পার্থ প্রতীম গোস্বামী গত ২৪/০১/২০২৪ দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে একটি বেসরকারী হাসপাতালে প্রয়াত হন। বয়স হয়েছিল ৬২ বৎসর।

জন্ম ১৯/৯/১৯৬২ অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগরে। অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার দাসপুরে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরে যোগ দেন। এল.ডি.এ সংগঠনে যুক্ত হন এবং ১৯৯২ সালে মেদিনীপুর থেকে বদলি হয়ে উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত জেলা প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরে যোগ দেন, ও ২০১১ সালের সরকার পরিবর্তনের পরে তাঁকে জিঙ্গলগঞ্জে শাস্তিমূলক বদলী করা হয়। প্রয়াত পার্থ গোস্বামী বিভাগীয় ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ লাইভ স্টক ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সভাপতি ও পত্রিকা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। অবসরের পরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির সদস্য হন। তাঁর চোখ দুটি দান করা হয়। প্রয়াত গোস্বামীর মরদেহ জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির দপ্তরে আনা হলে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। হালিশহর শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তিনি তিন ভাইয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূ ও নাতি বর্তমান। □

রাশিদ খান

ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পী উস্তাদ রাশিদ খান গত কয়েক বছর ধরে প্রস্টেট ক্যানসারে ভুগছিলেন। চিকিৎসায় সাড়া দিয়েছিলেন, কিন্তু তারপরেও বিপদ পুরোপুরি কাটেনি। কয়েকদিন আগে তাঁর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। শিল্পীকে দক্ষিণ কলকাতার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের সঙ্গে ক্যানসারের যোগ ছিল। সেইখানে ৯/০১/২৪ দুপুরবেলা বিদায় নেন সঙ্গীত শিল্পী উস্তাদ রাশিদ খান, বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর।

১৯৬৮ সালের ১ জুলাই উত্তরপ্রদেশের বদায়ুতে জন্ম তাঁর। তিনি রামপুর সহসওয়ান ঘরানার অন্তর্গত এবং এই ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা ইনায়েত হোসেন খানের প্রপৌত্র। রশিদ তালিম নেন উস্তাদ নিসার হোসেন খাঁয়ের কাছে। গোয়ালিয়র ঘরানার উস্তাদ গুলাম মুস্তাফা খাঁর থেকেও তালিম নিয়েছেন রশিদ। মূলত ধ্রুপদ সঙ্গীত গাইলেও বলিউড এবং টলিউডের ছবিতে বহু জনপ্রিয় গানও গেয়েছেন শিল্পী। সেগুলিও তাঁকে কম জনপ্রিয়তা দেয়নি।

উত্তরপ্রদেশে জন্ম হলেও খুব কম বয়সে কলকাতা চলে আসেন তিনি। থেকে যান এই শহরেই। সঙ্গীত, নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার, পদ্মশ্রী সম্মান যেমন পেয়েছেন, তেমন বাংলা থেকেও পেয়েছেন বঙ্গবিভূষণ সম্মান। শিল্পীর প্রয়াণে তাই শোকের ছায়া সব ধরনের সঙ্গীত প্রেমীদের মধ্যেই। তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী সোমা খাঁন, দুই কন্যা এবং এক পুত্রকে। বুধবার ১০/০১/২৪ তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। □

অনুপ ঘোষাল

বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ডঃ অনুপ ঘোষালের জীবনাবসান হয়েছে শুক্রবার (১৫-১২-২৩) দুপুরে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। দীর্ঘদিন তিনি বার্ধক্যজনিত সমস্যায় অসুস্থ ছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে সঙ্গীত জগত সহ বিভিন্ন মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করেছেন নানা অংশের মানুষ।

সঙ্গীতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন অনুপ ঘোষাল। সত্যজিৎ রায়ের অমর সৃষ্টি গুপি'র কণ্ঠে তাঁর অসামান্য গানগুলি আজও সমানভাবে সমাদৃত। এছাড়াও নজরুলগীতি, শ্যামাসঙ্গীত সহ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তিনি পারদর্শীতার পরিচয় দিয়ে গেছেন।

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'গুপি গাইন বাঘা বাইন', 'হীরক রাজার দেশে'র মতো ছবিতে তাঁর গলায় 'তোরা যুদ্ধ করে করবি কী তা বল', 'মহারাজা তোমারে সেলাম' ইত্যাদি গান আজও সমানভাবে জনপ্রিয়। 'হীরক রাজার দেশে'র গানের জন্য তিনি জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছিলেন। এছাড়াও 'সাগিনা মাহাতো', 'মাসুম' ইত্যাদি চলচ্চিত্রে তাঁর গাওয়া গানগুলিও অমর হয়ে রয়েছে। তিনি উত্তরপাড়া কেন্দ্র থেকে বিধায়কও নির্বাচিত হয়েছিলেন। □

নারায়ণ বিশ্বাস

দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থতার কারণে চিকিৎসারত অবস্থায় কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী ও শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের নেতা নারায়ণ বিশ্বাস ৫ ডিসেম্বর '২৩ সকালে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বৎসর।

দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সহ গঙ্গারামপুরের লড়াকু নেতা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন নারায়ণ বিশ্বাস। প্রাক্তন মন্ত্রী নারায়ন বিশ্বাসের অকাল প্রয়াণে একটি যুগের অবসান ঘটল বলে মনে করছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। প্রাক্তন মন্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা।

শ্রমজীবী আন্দোলনের নেতা নারায়ণ বিশ্বাস শ্রেণী আন্দোলনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিভিন্ন অঞ্চলে জোতদার-জমিদারদের বিরুদ্ধে গরিব ভাগচাষী কৃষকদের নিয়ে আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। কবিগান, লোকগীতি সহ সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও তাঁর অবদান ছিল। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার উন্নয়নের অবদানে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। বিশেষ করে গঙ্গারামপুরের জনজীবনের উন্নতিতে কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ, স্টেডিয়াম, রবীন্দ্রভবন, কালদিঘীর সৌন্দর্যায়ন সহ মৎস্য জীবীদের জীবিকার উন্নতি, তাঁত শিল্পের উন্নয়ন ও তাঁর শিল্পীদের সমবায় গড়ায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য মরদেহ মালদহ মেডিক্যাল হাসপাতাল এবং চক্ষু কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালে দান করা হয়। তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি সহ দুই ভাই বর্তমান। □

পরিতোষ দাস

রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের অন্যতম নেতা, পশ্চিমবঙ্গ রেকর্ড সাপ্লায়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক পরিতোষ দাস মঙ্গলবার (১৯/১২/২৩) ভোররাতে প্রয়াত হয়েছেন। বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। তাঁর স্ত্রী ও পুত্র বর্তমান। তিনি রাইটার্স বিল্ডিংস গ্রুপ-ডি কর্মচারী সমিতি ও রেকর্ড সাপ্লায়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির লবণহ্রদ জোনের সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন দায়িত্বশীল, নিষ্ঠাবান ও প্রতিবাদী সংগঠক। ছিলেন সদাহাস্যময় ও কর্মমুখর। তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সুমিত ভট্টাচার্য সহ বিশিষ্ট জনেরা। এক শোকবার্তায় তারা পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। □

মহাদেব চক্রবর্তী

প্রথিতযশা ইতিহাসবিদ, বরেন্য অধ্যাপক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা নেতৃত্ব মহাদেব চক্রবর্তীর জীবনাবসান হয়েছে। ১৭/ ১২/২০২৩ বুধবার সকালে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

তাঁর মৃত্যুর খবরে ত্রিপুরা এবং কলকাতায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। হাসপাতাল থেকে প্রথমে রবি হাসপাতাল সংলগ্ন আবাসন প্রকল্পের বাসভবনে নিয়ে আসা হয় তাঁর দেহ। বিভিন্ন স্তরের বিদ্বজনেরা তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। তাঁরা সমবেদনা জানান অধ্যাপক মহাদেব চক্রবর্তীর স্ত্রী, ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন ডঃ তপতী চক্রবর্তী, পুত্র দিগন্ত চক্রবর্তী, কন্যার অমৃতা চক্রবর্তী সহ আত্মীয় পরিজনদের। কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

মহাদেব চক্রবর্তী অধ্যাপনার প্রথম জীবন থেকেই ত্রিপুরায় শিক্ষায় সার্বিক অগ্রগতি এবং ছাত্র শিক্ষকের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সাথে নিবিড় ও অত্যুকৃত্রিমভাবে যুক্ত ছিলেন। ত্রিপুরায় জনমুখী সাংস্কৃতিক কর্মধারায় বিকাশ ও সুসংহত করার প্রথম সারির অন্যতম নেতৃত্ব হিসাবে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে গুরুদায়িত্ব প্রতিপালন করে গেছেন। ত্রিপুরার সাথে তাঁর আত্মিক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন তৈরি হয়েছিল। ত্রিপুরার গুনীজন মহলে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সমীহের স্থান লাভ করেছিলেন। শারীরিক কারণে ধারাবাহিকভাবে নিয়মিত উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজনে আন্তরিক অনাগ্রহ সত্ত্বেও তাঁকে ত্রিপুরা থেকে কলকাতায় চলে আসতে হয়েছিল।

অধ্যাপক মহাদেব চক্রবর্তী স্বনামে এবং পথিক সেন ছদ্মনামে অসংখ্য নিবন্ধ লিখেছেন। ১৯৪২ সালের ১৩ জানুয়ারি হুগলী জেলার তারকেশ্বরে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাবল এম.এ করার পর ১৯৬৭ সালে ত্রিপুরার কৈলাশহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৭৮ থেকে আগরতলায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি জি সেন্টারে অধ্যাপনা শুরু করেন। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে সেখানে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। পরে ওই বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হন। ২০০৭ অবধি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ক 'মহাত্মা গান্ধী অধ্যাপক'। ছিলেন ইন্ডিয়ান হিস্টরিকাল রেকর্ডস কমিশনের সদস্য, ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া হিস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন সহ বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে। দেড় শতাধিক গবেষণা প্রবন্ধ লিখেছেন, রচনা ও সম্পাদনা করেছেন ১৮ গ্রন্থে। ১৯৯৭ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত ছিলেন ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক। কিছু সময়ের জন্য আসীন ছিলেন ত্রিপুরা স্টেট কলা একাডেমির চেয়ারম্যান পদেও। ছাত্রদরদি ও জনপ্রিয় অধ্যাপক মহাদেব চক্রবর্তী শিক্ষাদানের পাশাপাশি বিশেষত কৈলাসহরে গণতান্ত্রিক শিক্ষক, অধ্যাপক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। যত্ন নিয়েছেন বিকাশমান গণতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলনের। □

চন্দন ব্যানার্জী

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির হাওড়া জেলার প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির (W.B.M.O.A)-এর প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ চন্দন ব্যানার্জী ১৩/১২/ ২৩ বুধবার দুপুর ২.৩০ মিনিটে প্রয়াত হয়েছেন। বুধবার ১০/১/২৪ হাওড়া জেলা কো-অর্ডিনেশন দপ্তরে প্রয়াত চন্দন ব্যানার্জীর স্মরণে অনুষ্ঠিত স্মৃতিচারণ করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য তথা কোষাধ্যক্ষ লিটন পান্ডে, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি হাওড়া জেলা সম্পাদক সঞ্জয় দাস, শেখর ঘোষ ও ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক বিজন মান্না। সভাপতিত্ব করেন শেফালী নস্কর, স্মৃতিচারণা করে সঞ্জয় দাস বলেন, আমরা নেতা ও কর্মীদের স্মরণসভায় প্রয়াতদের প্রতি যেমন শোকজ্ঞাপন করি, তেমনি তিনি যে আদর্শের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সেই আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণ করি। বর্তমান সময়ে দেশে আর এস এস ও বিজেপি রাম মন্দিরের নামে ধর্মের সাথে রাজনীতিকে মিশিয়ে দিয়ে ধর্মের নামে মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে চাইছে। আজ দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা ও সংবিধান আক্রান্ত। □

সুকান্ত চৌধুরী

আজকের সময়ে সংগঠনের আশু জরুরি কাজ

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী
(সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি)

সর্বস্তরের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি, সংগ্রামের ক্ষেত্রে অপরিচিত মানুষের নতুন নতুন কণ্ঠস্বর, নতুন নতুন ভাবনা, নতুন করে বিভ্রান্তির উপাদান সৃষ্টি প্রভৃতি ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতে উদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই সংগঠনের সামনে যে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, তার কিছু জরুরি বিষয় আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে এই লেখা।

যে কোনো সংগঠন পরিচালনায়, তা সে কর্মচারীদের সংগঠন হোক বা অন্যান্য অংশের, তাকে সচল রাখতে হলে সুনির্দিষ্ট বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে উদ্ভুত সমস্যার সমাধানে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। তাৎক্ষণিকভাবে কিছু সাফল্য আসলেও সমস্যার পাহাড় অনেক সময় হতাশার জন্ম দেয়। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত দিক থেকে দেখলে সংগঠনে এই হতাশার কোনো জায়গা নেই। সমস্যা থাকলে তবেই সংগঠন-আন্দোলন জীবন্ত এবং গতিশীল; সমস্যা না থাকলে সংগঠন-আন্দোলনের প্রাণবন্ততা নিষ্প্রভ। আন্দোলন কখনও সরলরেখায় বা একই ধরাবাঁধা ছকের মধ্য দিয়ে এগোয় না। বিভিন্ন পরিস্থিতির প্রতিকূলতার মধ্যে সঠিক পথ তৈরি করে আন্দোলনকে এগোতে হয়। সমাজ জীবনে বিভিন্ন ঘটনাবলীর ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সংগঠনের কর্মী তথা সর্বস্তরের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া, যে হতাশার সৃষ্টি হয়, তার অনিবার্য কারণেই সংগঠন-আন্দোলনের সামনে সমস্যাও দেখা দেয়। এহেন পরিস্থিতির বিভিন্নতার মধ্যেও একটা সাধারণ বিষয় সবসময়ে থাকে তা পরিস্থিতির নেতিবাচক প্রবণতার মধ্যেও ইতিবাচক দিক। এই উভয় দিককে যথাযথ মূল্যায়ন করতে না পারলে কাল্পনিক ধারণা গ্রাস করে। মনগড়া ধারণা তৈরি হয়। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোনো সংগ্রামের সফলতা বা ব্যর্থতা, হারা বা জেতা সংগ্রামের আশু ফলাফলের ওপর নির্ভর করে না। সংগ্রামের আসল সাফল্য নির্ভর করে সংগঠনের ভবিষ্যৎ লাভের ওপর। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কতখানি ঐক্য সংহতি প্রকাশ ঘটেছে কতখানি উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হচ্ছে, কর্মচারীদের কতখানি আত্মত্যাগের মানসিকতা প্রকাশ ঘটছে সর্বোপরি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সংগঠনের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক চেতনার মানের উন্নতি ঘটছে কিনা—এটাই ইতিবাচক দিক।

বিগত কয়েক বছরে দেশে শ্রমজীবী তথা কর্মচারী আন্দোলনের উপর আক্রমণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় কর্মচারী তথা ট্রেড ইউনিয়ন এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর আক্রমণের চিত্রটা ভিন্ন এবং চারিত্রিক দিক থেকে ফ্যাসিস্ট সুলভ। অতীতের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল আন্দোলনকে দমিয়ে দেওয়া, পর্যুদস্ত করা। আর এই সময়ের লক্ষ্য সরাসরি ট্রেড ইউনিয়ন এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে বহুমুখী বিভাজন ঘটিয়ে সংগঠনগুলিকে গুঁড়িয়ে দেওয়া।

পশ্চিমবাংলার এ ধরনের আক্রমণ সংগঠিত করার কারণ অনুসন্ধানে গভীরে প্রবেশ করা প্রয়োজন। অর্থনীতির অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে দ্রুত অর্থনৈতিক সঙ্কটের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে আক্রান্ত মানুষদের যে অংশকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে সংগঠিত করা সম্ভব হয়েছে, সেইসব মানুষদের দ্রুত মোহমুক্তি ঘটিয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে যুক্ত করা গেছে। রাজ্যব্যাপী সংগ্রামের নতুন প্রবাহে শাসকশ্রেণীর অস্তিত্বকে দুর্বল করে দিতে পারলে তার প্রভাব সমাজের অন্যান্য স্তরে সর্বোপরি দেশব্যাপী শাসকশ্রেণীর আক্রমণের বিরুদ্ধে সচেতন করা সম্ভব হয়। তাই শাসকশ্রেণী সচেতনভাবেই অন্যান্য রাজ্যের মানুষের মোহমুক্তি ঘটানোর আগে আন্দোলনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা রাজ্য বাংলার ট্রেড ইউনিয়ন এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে রোখা যায়, তাহলে বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ যখন সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে, তখন তাদের সামনে কোনো নিশানা থাকবে না। গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে অতি সহজেই দমিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় বাংলাকে আক্রমণের মূল ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছে শাসকদল। আক্রমণের ধরণ জার্মানি, ইতালি ইত্যাদি দেশের নাজী শাসনের ন্যায় শুধু প্রশাসনিক আক্রমণই নয়, তার সাথে সন্ত্রাস সৃষ্টি, ভয় দেখিয়ে শাসকদলে নাম লেখানো, জোর করে ট্রেড ইউনিয়ন দখল। কারণ শাসকশ্রেণি জানে যে সংগঠনকে গুঁড়িয়ে দিলে এবং শ্রেণীসত্তাকে ভুলিয়ে দিতে পারলে মহার্ঘভাতা বাড়ানো, চাকরিগত অবস্থার উন্নতি, অধিকার মান-মর্যাদার কথা তাদের শুনতে হবে না এবং কোনো চাপের সম্মুখীন হতে হবে না। কর্মচারীদের বিবেক-বুদ্ধিহীন, গোলামে পরিণত করা সম্ভব হবে। দমন-পীড়ন ও উপেক্ষার মাত্রাকে বল্গাহীন ভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

বাস্তবে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও সংগঠনকে ভেঙে ফেলা বা অপ্রাসঙ্গিক করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে কি? সম্ভব হয়নি। কর্মচারীদের আত্মত্যাগ, সাহস এবং অদম্য জেদের কাছে শাসকশ্রেণী হার মানতে বাধ্য হয়েছে। কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষা করার একমাত্র ঘাঁটিকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এটা কি বড় সাফল্য নয়? হয়তো এই সময়ের মধ্যে বড় কোনো অর্থনৈতিক দাবি অর্জন করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান সঙ্কটজনক অবস্থায় অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা পারিবারিক দুর্দশাকে কিছুটা লাঘব করতে পারে। কিন্তু অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার উর্ধ্বে চাকরির নিরাপত্তা রক্ষা করা। অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণের দাবিকে কার্যকরী করার পূর্বশর্ত সংগঠন। আজ পর্যন্ত কর্মচারীদের যেটুকু চাকরিগত নিরাপত্তা সৃষ্টি হয়েছে বা চাকরিগত অবস্থার উন্নতি হয়েছে, মান-মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে কাজ করার যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলি কি সংগঠন-আন্দোলন বাদ দিয়ে সম্ভব হয়েছে? অভিজ্ঞতা বলছে একমাত্র সংগঠনের ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে সমস্ত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু আজ অর্জিত অধিকার (সে গণতান্ত্রিক অধিকার হোক বা অর্থনৈতিক অধিকার) প্রধানতম সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। সেই ধারাবাহিক সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র হাতিয়ারকে গুঁড়িয়ে দেবার সর্বাত্মক আক্রমণকে প্রতিহত করে সংগঠনকে অটুট রাখা সম্ভব হয়েছে। সর্বব্যাপী প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রচণ্ড দমন-পীড়নের মধ্যেও কর্মীরা সংগঠন ছেড়ে চলে যাননি। শাসকদলের রোষানলে বদলী হয়েও আন্দোলন করা যায়, হুমকির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শিড়দাড়া সোজা রেখে আন্দোলন করা যায়, সমস্ত ধরনের প্রলোভনকে উপেক্ষা করে চোখে চোখ রেখে লড়াই করা যায়, মিথ্যা মামলার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে আন্দোলন-সংগঠন করা যায়—একথা তারা বারে বারে প্রমাণ করেছেন। গুণগত দিক থেকে 'সংগঠনগত' এই লাভের মূল্য অপরিসীম। আন্দোলনকে স্তিমিত রেখে আক্রমণের স্থিমিতকরণ করা যায় না কি!

শাসকশ্রেণী তার টিকে থাকার স্বার্থে, শোষণকে সংহত করার স্বার্থে সর্বদাই শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনকে স্তিমিত করতে চায়। পর্যুদস্ত করতে চায়। অপরদিকে শোষণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় অনিবার্যভাবেই শোষিত-নিপীড়িত মানুষের জীবন-জীবিকা, অধিকার এবং অস্তিত্বের উপরে আসা আক্রমণকে রোখার জন্য সর্বোপরি শ্রমদাসত্বের মুক্তি ঘটিয়ে সেই আক্রমণকে চিরতরে বন্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে শ্রমজীবী মানুষ আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়। শ্রমদাসত্বের মুক্তি ঘটে। এটাই হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞানের কথা। তাই আন্দোলনকে স্তিমিত রেখে বা আন্দোলন না করলে যদি আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যেত তাহলে সংগঠন আন্দোলনের কোনো প্রয়োজন থাকত না। সংগ্রামকে তীব্র থেকে তীব্রতর করার মধ্য দিয়ে আক্রমণকে প্রতিহত এবং স্তিমিত করা যায়—এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য।

অন্যান্য স্তরের শ্রমজীবী মানুষের পাশাপাশি রাজ্য সরকারি কর্মচারী হিসাবে আমরা আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাই, যখন আন্দোলন সামগ্রিকভাবে স্তিমিত রাখতে হয়েছিল, তখন আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া তো দূরের কথা জীবন-জীবিকা, অধিকার ও চাকরিগত অবস্থার ওপর আক্রমণ আরও বেশি ছিল। চাকরির নিরাপত্তা ছিল না। ছাঁটাই-এর অভিশাপকে মাথায় নিয়ে কাজ করতে হত। অনেক বাধা-বিপত্তি, দমন-পীড়নকে প্রতিহত করে আন্দোলনকে ধাপে ধাপে তীব্র থেকে তীব্রতর করার মধ্য দিয়েই আক্রমণকে প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছিল। আন্দোলনকে স্তিমিত রেখে বরখাস্ত কর্মচারীদের পুনর্বহাল করা তো দূরের কথা, মানমর্যাদা নিয়ে চাকরি করার মতো অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব হত না। আন্দোলনের পক্ষ থেকে সরে দাঁড়ালে আধা ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের বাতাবরণ থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হত। পরিস্থিতিতে সন্ত্রাসের মোকাবিলা করা কি সম্ভব হত? তাই ধর্মঘট বা এই ধরনের বৃহত্তর আন্দোলন করলে বেতন কাটা যায়, তাই এই ধরনের আন্দোলনের প্রয়োজন নেই—এই ধরনের ভাবনা শাসকশ্রেণি সুকৌশলে মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দিতে চায়। কিন্তু এই পর্যায়ের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমাদের যে বেতন কাটা গিয়েছে তার চাইতে বহুগুণ বেশি বেতন ক্ষয় হয়েছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে। এই ধরনের সর্বোচ্চ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা পাওয়ার অধিকার আদায় করা সম্ভব হয়েছিল, যা পুনরায় আক্রমণের শিকার। তাই আন্দোলনকে স্থিমিত রেখে আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যায় না—তাতে আক্রমণ আরও বাড়ে।

অর্থনৈতিক ও চাকরিগত দাবি-দাওয়া আদায়ের সাথে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কি সম্পর্ক?

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাফল্যের প্রধান শর্ত হচ্ছে জনগণের সমর্থন। গণতান্ত্রিক আন্দোলন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের থেকে বিচ্ছিন্ন বা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উর্ধ্বে অবস্থিত কোনো বিষয় নয়। শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিটি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন হচ্ছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর জনগণের সমর্থনের সংগঠিত প্রকাশ ঘটে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমজীবী মানুষের স্ব স্ব ক্ষেত্রে শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগঠিত আন্দোলনের সামগ্রিক রূপই হচ্ছে গণতান্ত্রিক আন্দোলন।

তাই শাসকশ্রেণি নিজস্ব স্বার্থে চায় বিভিন্ন স্তরের শোষিত মানুষের সংগ্রামকে গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে। আর এই বিচ্ছিন্ন করতে পারলে সেই সমস্ত অংশের ওপর আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। শাসক শ্রেণির এই অপকৌশলকে সচেতনভাবে মোকাবিলার পরিবর্তে আক্রমণ থেকে নিস্তার পেতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে দূরত্ব বজায় রেখে নিজ নিজ ক্ষেত্রে আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই শ্রেয় মনে করেন। এক কথায় বললে, ঝুট-ঝামেলায় না গিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে দূরত্ব বজায় রাখাই একমাত্র পথ হিসাবে মনে করেন।

গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে ট্রেড ইউনিয়ন বিচ্ছিন্ন করতে পারলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি-দাওয়া আদায়ের পেছনে যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রভাব রয়েছে তাকে গৌণ করে দেওয়া সম্ভব হয়।

গণতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যতিরেকে শুধুমাত্র নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়নের দাবিকে মান্যতা দিয়ে শাসকশ্রেণী এমনি এমনি কিছু দিয়ে দিত তাহলে স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও সরকারী কর্মচারীরা কুখ্যাত সার্ভিস কন্ডাক্টস্ রুলের মধ্যে আবদ্ধ থাকত না। কর্মচারীদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটত। আবার শুধুমাত্র নিজস্ব ট্রেডের দাবি নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করলেই যদি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত তাহলে যৌথ আন্দোলনের প্রয়োজন হত না। ১৯৫৬ সালে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন বা ১৯৬৬ সালে রাজ্যে ১২ই জুলাই কমিটির সৃষ্টি হত না। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে মৈত্রী গড়ে তোলার কোনো প্রয়োজন হত না।

এই রাজ্যে একটা সময় পর্যন্ত দীর্ঘ সময়কালে চাকরি করা সত্ত্বেও অস্থায়ী কর্মচারী হিসাবে থাকায় কোনো পেনশন ছিল না। প্রায় ৮০ শতাংশ কর্মচারীকে অবসরগ্রহণ করতে হত পেনশন না পেয়ে। ফ্যামিলি পেনশন ছিল না। Permanent, Quasi-Permanent কিছুই ছিল না, জেলা, মহকুমা বা ব্লকস্তর পর্যন্ত হাউস রেন্ট ছিল না। আমলাদের আক্রমণ ছিল বল্গাহীন। গণতান্ত্রিক আন্দোলন বা যৌথ আন্দোলন ব্যতিরেকে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত এই সমস্যাগুলির সমাধান হল না কেন? ১৯৫৬ সালে কো-অর্ডিনেশন কমিটির যৌথ পথ চলা শুরু হলে তাকে আরও বৃহত্তর পরিসরে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ১৯৬৬ সালে ১২ই জুলাই কমিটির গঠনপর্বে পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উচ্চ মেজাজের পটভূমিতা উপরোক্ত সমস্যার সমাধান হয়েছিল। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবেই ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তৎপরবর্তীতে কর্মচারীদের অধিকাংশ সমস্যার সমাধান হয়েছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকারের কর্মচারী স্বার্থবাহী শ্রেণিদৃষ্টির কারণে সেই সময়েই পাওয়া গিয়েছিল সবচাইতে বেশি এককালীন মহার্ঘভাতা।

এর থেকে পরিস্কার, সমিতিগত বা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিগত প্রচেষ্টায় সাফল্যের পেছনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কী প্রভাব রয়েছে।

তাই শাসকশ্রেণির এই অপকৌশলকে ব্যর্থ করতে গেলে শ্রমজীবী মানুষকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে যাতে সামগ্রিক গণআন্দোলন থেকে শ্রমজীবী মানুষকে বিচ্ছিন্ন করতে না পারে। এটাই বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের এই দিক-নির্দেশক কথাগুলি সবসময় মনে রাখতে না পারলে নানান সময়ে নানান প্রশ্ন দেখা দেয়। বিশেষ করে যখন সংগ্রামের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ নেমে আসে।

সরকারী কর্মচারীরা কি রাজনীতি করতে পারেন?

রাজনীতি বলতে আমরা কী বুঝি? সোজা কথায় শাসন ব্যবস্থা পরিচালন ব্যাপারে সাধারণ মানুষের কথা বলার অধিকারেরই অপর নাম রাজনীতি। আর ঠিক এই ব্যাপারটাতেই শাসকদলের প্রচণ্ড আপত্তি। মনে হতে পারে এই আপত্তি শুধুমাত্র সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু গভীরে গিয়ে বিচার করলে দেখা যায় শুধুমাত্র সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই নয়, জনসাধারণের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কেই তাদের এই বক্তব্য।

শ্রমজীবী মানুষ তার শ্রমের ন্যায্যমূল্য কেন পাবে না, দেশ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও শোষণতন্ত্রই কেন কায়েমি হয়ে উঠছে বা দেশ স্বাধীন অর্থনীতির পরিকল্পনা গ্রহণ করার পরেও কেন অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দেয় এবং হাজার হাজার শ্রমিকের চাকরি ছাঁটাই করে পুঁজিপতিশ্রেণী সরকারি সহায়তার মন্দার হাত থেকে নিজের মুনাফা রক্ষার পথ বেছে নয় এসব প্রশ্ন বিশুদ্ধ অর্থে 'রাজনৈতিক'! সুতরাং এই প্রশ্ন সরকারি কর্মচারীদের বৃহত্তর স্বার্থে হলেও তা পরিহারযোগ্য।

'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে'র জমিদারী প্রথা বিলোপ(!) সত্ত্বেও দেশে ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি কেন বণ্টন করা হবে না, উৎপাদনের ন্যায্য মূল্য কেন উৎপাদনকারীরা পাবে না বা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের দাম নির্ধারণে সরকার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না—এটাই ভবিতব্য মেনে না নিয়ে যদি বর্তমান অবস্থা পরিবর্তনের দাবি জানানো হয় তবে সেটা হবে নিছক রাজনীতি।

দেশে শিক্ষার সুযোগ কেন ক্রমাগত সঙ্কুচিত হচ্ছে, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও কেন শিক্ষাকে বিজ্ঞানসম্মত বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা গেল না, শিক্ষান্তে চাকরির নিশ্চয়তা নেই কেন, কেন সংবিধান নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও অনৈতিক প্রাথমিক শিক্ষাকে সঙ্কুচিত করে শিক্ষায় বেসরকারীকরণ উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে, সর্বোপরি জনসাধারণের বিপুল অংশকে আজও কেন নিরক্ষরতা মুক্ত করা যায়নি ইত্যাদি প্রশ্ন নিতান্তই অস্বস্তিকর, সুতরাং 'রাজনৈতিক' এই প্রশ্ন ছাত্র সমাজ করলে তাদের 'দেশদ্রোহী' চিহ্নিত করা

● অষ্টম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

ভারতের সমন্বয়ী ঐতিহ্য

অমলেন্দু দে

লেখাটি ২০০১ সালে মালদহে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ রাজ্য সম্মেলনের বিশেষ সংখ্যা সংগ্রামী হাতিয়ারে মুদ্রিত হয়েছিল। বর্তমান সময়ের প্রাসঙ্গিকতাকে বিবেচনায় রেখে এই সংখ্যায় লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হল। লেখক বর্তমানে প্রয়াত ডঃ অমলেন্দু দে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক।

বহু ধর্মীয় ভারতে সমন্বয়ের ঐতিহ্য সব সময়ে প্রবহমান ছিল। রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সম্প্রতি এই ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা ক্রমশ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হচ্ছে। জনমানসে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। মধ্যযুগের ঘটনাবলী উল্লেখ করে আমাদের জীবনধারার এই প্রবাহকে অগ্রাহ্য করার প্রয়াস চলছে। স্বভাবতই তথ্যনির্ভর আলোচনারও অভাব ঘটছে। এই কথা মনে রেখেই আলোচ্য বিষয়ের ওপর সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। ভারতে ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকে ভারতীয় জীবনধারায় প্রধানত তিনটি উপাদানের উদ্ভব ঘটে; যথা—সংঘাৎ (Conflict), পরস্পরের গুণের সমাদর (mutual appreciation) ও সদৃশকরণ (assimilation) প্রথমদিকে রাজ্যজয়ের ও আধিপতা স্থাপনের সময়ে সংঘাতের উপাদানই শক্তিশালী ছিল। কিন্তু প্রাধান্য স্থাপনের পর রাজ্যশাসনের প্রয়োজনে মুসলমান শাসকদের হিন্দু-প্রজাদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। একই রাজ্যে বসবাস করার ফলে তাদের পরস্পরের পরিচয় হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দী শেষ হওয়ার সময়ে এই যোগাযোগের ও পরিচয়ের সূত্রপাত লক্ষ করা যায়। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত সময়কালে এক সম্প্রদায়ের প্রভাব অন্য সম্প্রদায়ের ওপর পড়ে। তার এক স্বচ্ছ চিত্র পাওয়া যায়। সংঘাতের ক্ষেত্রটি সংকুচিত হতে থাকে এবং পরস্পরের গুণের সমাদর ও সদৃশকরণের উপাদানগুলো ক্রমবর্ধমান হতে থাকে। তার ফলে ভারতীয়ত্বের (Indianism) রূপ পরিস্ফুট হয়। এই সময়ে ভারতে মুসলিম জনবিন্যাসেও পরিবর্তন ঘটে। বিদেশ থেকে আগত মুসলমানরা ভারতেই স্বাথীভাবে বসবাস করতে থাকেন। বর্ণভেদ প্রথায় পীড়িত ও নির্যাতিত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলামের সাম্যনীতির আকর্ষণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ফলে মুসলিম জনবিন্যাসেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বহিরাগত মুসলমানদের তুলনায় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সংখ্যা বেশি হওয়ার ভারতীয় মুসলিম জনবিন্যাস নতুন আকৃতি ধারণ করে। ক্রমশ বহিরাগত মুসলমানদের সংখ্যা আরও হ্রাস পায়।

এই প্রেক্ষাপটেই মধ্যযুগের ভারতের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে সমন্বয়ের উপাদানগুলো আলোচনা করা যাক। রাজতন্ত্র সম্বন্ধে মুসলিম শাসকদের কী ভাবনা ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের একাদশ শতাব্দীর সূচনায় ফিরে তাকাতে হয়। ১০১০ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত ইরানীয় কবি ফিরদৌসীর 'শাহনামা' রচনার কাজ শেষ হয়। এই বিখ্যাত গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি শাসক ও রাজনৈতিক তত্ত্ববিদদের চিন্তাকে এক নতুন দিকে প্রবাহিত করেন। তার ফলে ইসলামিক রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। রাজতন্ত্রের আলোচনায় বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়। রাজা ততদিনই ঐশ্বরিক আনুকূল্য লাভ করেন যতদিন না তা ঈশ্বর তার কাছ থেকে কেড়ে নেন। এই গ্রন্থে প্রাচীন ইরানের রাজাদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। জামসিদ নামে একজন বিখ্যাত রাজা ইরানে ছিলেন। তিনি বলেন, তিনি ঐশ্বরিক অনুগ্রহ লাভ করেছেন। তিনি এই কথাও বিশ্বাস করেন যে, একই সঙ্গে তিনি রাজা ও পুরোহিত। তাঁর দায়িত্ব হল, দুর্বৃত্তদের দমন করে প্রজাদের রক্ষা করা, আর পাপীদের সৎপথে পরিচালনা করা। সুতরাং ঐশ্বরিক আনুকূল্য লাভের অধিকারী রাজা একজন সুশাসক হিসেবেই বিরাজ করবেন। প্রাচীনকালে ইরানে রাজতন্ত্র সম্বন্ধে এই ধারণাই গুরুত্ব পায়। 'অবেস্তা' ধর্মগ্রন্থেও এই তত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাজতন্ত্র সম্বন্ধীয় এই তত্ত্ব এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, আবু হামিদ মুহম্মাদ অল-ঘাজালির (১০৫৮-১১১১ খ্রিঃ) মতো গোঁড়াপন্থী পণ্ডিতও তা অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। আরবি, ফারসি ও অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায়, একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজার প্রধান কর্তব্য কী, এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত আলোচনা চলে। এই কথা বলা হয়, রাজার প্রধান কর্তব্য হল ন্যায়বিচার সাধন করে রাজ্যকে সমৃদ্ধশালী করা। এই আলোচনায় অনেকেই অংশগ্রহণ করলেও যে দু'জন পণ্ডিতের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন তাঁরা হলেন—নিজামউল-মুলক টুসি (১০১৮-৯২ খ্রিঃ) ও আবু বকর মুহম্মদ বিন অল-ওয়ালিদ অল টুরটুসি (১০৫৯-১১২৭খ্রিঃ)।

তৈমুর ও আকবরের রাজত্বকালের মধ্যে রাজনৈতিক তত্ত্বের দুটো প্রধান ধারা দানা বাঁধে—একটি হল ঘাজালিয়ান এবং অন্যটি হল দার্শনিক। দ্বিতীয় ধারাটিকে আরও সজীব করেন দার্শনিক ইবন সিনার (৯৮০-১০৩৭ খ্রি:), বিখ্যাত টীকাকার খাজা নাসিরউদ্দীন টুসি (১২০১-৭৪ খ্রি:)। ঘাজালিয়ান তত্ত্বের সঙ্গে নাসিরিয়ান রাজনৈতিক দর্শনের সমন্বয় সাধন করেন আবুল ফজল (১৫৫১-১৬০২ খ্রি:)। সম্রাট আকবরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই আবুল ফজল বিভিন্ন ধর্মের প্রজা যাতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে তার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে যুক্তিসঙ্গত রূপদানে উদ্যোগী হন এবং রাজনৈতিক আদর্শের বিভিন্ন ধারাকে সমন্বয় করে নবরূপ দান করেন। তিনি ন্যায়নীতির ওপর রাজতন্ত্রকে স্থাপন করেন। সকলের পক্ষে উপযোগী করে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার ফলে অ- মুসলমানরাও মুঘল শাসনকে মেনে নেয়। প্রশাসন ব্যবস্থায় দায়িত্বশীল পদেও হিন্দুরা অধিষ্ঠিত হন। মুঘল সম্রাটরা নিজেদের 'ভারতীয়' বলে মনে করেন এবং তারা 'হিন্দুস্থানের সম্রাট' এই পদবী ধারণ করে গর্ববোধ করেন। আর তাদেরই প্রয়াসে ভারতে 'একটি সুসংহত প্রশাসনিক ঐতিহ্য' গড়ে তোলা সম্ভব হয়। রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যেই আকবর 'সুল-ই-কুল' বা সর্বজনীন ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করেন। ইবন অল-অরাবির (১১৬৫-১২৪০ খ্রিঃ) দর্শনের অনুগামীরা যে ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন তার উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় বিরোধ দূর করা। আকবর এই আদর্শকে তাঁর রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করেন। তার বিশ্বজনীন নীতির ভিত্তিও হল এই আদর্শ। তাকে অবলম্বন করে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এই কারণে বাইরে থেকে যে সব মুসলমান তখন ভারতে আসতেন তারা এই রাষ্ট্রীক ব্যবস্থা লক্ষ্য করে মনে করতেন, 'ইসলামের তরবারি চালনা করছে হিন্দুরা'। স্বৈরতন্ত্রকে শাসনতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার মধ্যে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হওয়ায় মুঘল সম্রাটদের কর্তৃত্ব দীর্ঘকাল অব্যাহত থাকে। একসঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করার ফলে উত্তর ভারতের অনেক জায়গাতেই হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর একটি 'হিন্দুস্থানী জীবনধারা' গড়ে তোলেন। এইসব লক্ষ্য করেই ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাবর মন্তব্য করেন, ভারতে সব কিছুই চলছে 'হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে'।

মধ্যযুগে ভক্তি ও সূফী আন্দোলনের ফলে হিন্দু ও মুসলমানের নৈকট্য বৃদ্ধি পায়। ধর্ম নির্ভর ঔদার্যবোধের, মানবিকতাবোধের ও যুক্তিশীলতার পথ প্রশস্ত হয়। একাদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালে ভক্তি আন্দোলন হিন্দু সমাজে এক গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করে। সমগ্র ভারতে অসংখ্য সাধকের আবির্ভাব ঘটে। রামানন্দ, কবীর, দাদু দয়াল, চৈতন্যদেব, গুরু নানক, রজ্জব, শংকরদেব প্রভৃতি সাধকরা বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। তারা ধর্মতত্ত্বের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবসেবার আদর্শ প্রচার করেন। সাধকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নিম্নবর্ণের। তাঁদের মুসলমন শিষ্যও ছিলেন। প্রায় একই সময়ে সুফী মতবাদও প্রচারিত হয়। ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রভাব বিস্তারে সুফীদের উল্লেখযোগ ভূমিকা ছিল। সুফীরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পার্থক্যও লক্ষণীয়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে বিখ্যাত সুফী সাধক শেখ মৈনুদ্দীন চিস্তী আজমীরে বাস করতেন। তাঁর অনুগামী সুফীদের চিস্তী সম্প্রদায় বলা হত। মৈনুদ্দীন চিস্তী তাঁর শিষ্যদের বলতেন, "উচ্চ পর্যায়ের ঈশ্বরের আরাধনা হল জনসাধারণের দুর্গতি দূর করা, অসহায়ের প্রয়োজন মেটানো এবং ক্ষুধার্তদের আহার দেওয়া।" তিনি তাঁর শিষ্যদের "নদীর মতো ঔদার্য, সূর্যের মতো অনুরাগ এবং পৃথিবীর মতো আতিথেয়তা আয়ত্ত করতে" বলতেন। এমন কি চিস্তী সাধকরা শাসকদের দেশ শাসনে বৈষম্যমূলক নীতি পরিহার করতে বলতেন। স্বভাবতই চিস্ত-ধর্মচিন্তার সঙ্গে হিন্দু-ধর্মচিন্তার সংযোগ স্থাপন সহজেই ঘটে। হিন্দু যোগী ও সুফী সাধকরা ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রটিকে অনেকটা ব্যাপ্ত করেন।

আবুল ফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে রামায়ণ, মহাভারত ও কৃষ্ণের কাহিনী আলোচিত হয়। তিনি এই গ্রন্থের মাধ্যমে মুসলমানদের হিন্দু ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করান। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থও ফারসিতে অনূদিত হয়। অন্যদিকে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে হিন্দুদের পরিচিত করার প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়। যুবরাজ দারা শুকো সংস্কৃত শিখে উপনিষদ ফারসিতে অনুবাদ করেন। তাঁর রচনাবলীর মাধ্যমে ইসলাম ধর্মনির্ভর ঔদার্যবোধের ধারাটিকে সজীব করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতা বর্জন করে যাতে হিন্দু ও মুসলমান একসঙ্গে চলতে পারে তার জন্য তিনি 'মাজমা উল বাহারাইন' নামে এক আকর্ষণীয় গ্রন্থ রচনা করেন ।

সুলতানী আমলে ফারসী ও সংস্কৃত সাহিত্যের পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষাগুলোরও বিকাশ ঘটে। হিন্দুদের রাজনৈতিক প্রাধান্য হ্রাস পেলেও সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য চর্চা অব্যাহত থাকে। এই সময়ে বিভিন্ন ভাষায় যেসব সেকুলার সাহিত্য রচিত হয় তার মধ্যেও সমন্বয়ী উপাদান পাওয়া যায়। উল্লেখ্য এই ইসলামের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা বিভিন্ন দেশের শিল্পরীতি আয়ত্ত করে নিজেদের শিল্পরীতিকে উন্নত করে। ভারতে আসবার আগেই সারাসিনীয় স্থাপত্য শিল্প সমৃদ্ধ ছিল। তার সঙ্গে হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের মিলনে ভারতীয় স্থাপত্য শিল্প নবরূপ ধারণ করে। এই মিশ্রণকে ইন্দো-সারাসিনীয় স্থাপত্য রীতি হিসেবে অভিহিত করা হয়। লোদী স্থাপত্য রীতিতে হিন্দু প্রতিভার সংমিশ্রণ হওয়ায় 'প্রাণের ও ভাবের' সঞ্চার ঘটে। এই ধারাটিই মুঘল যুগে আরও ব্যাপ্তিলাভ করে। অবশ্য ভারতের বহু স্থানে আঞ্চলিক শিল্পরীতির নিদর্শন পাওয়া যায়। কোথাও আবার সামরিক স্থাপত্যে ইউরোপীয় ও পারসিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

দীর্ঘকাল ধরে মুঘল সাম্রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় থাকায় শিল্পকলার ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটে, ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবন সমৃদ্ধ হয়। কয়েকটি অঞ্চলের সংস্কৃতিও বিশিষ্টতা লাভ করে। বাবর থেকে শাহজাহান পর্যন্ত সব কয়জন সম্রাটই এই বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই সময়ে স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পে ভারতীয় ও বিদেশী রীতির সংমিশ্রণ ঘটে। আকবর শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতীয় পদ্ধতিকে উৎসাহিত করেন। তিনিই উদ্যোগী হয়ে বিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলিম শিল্পীদের আঁকা চিত্রের সাহায্যে 'বাবর-নামা' গ্রন্থের শোভাবর্ধন করেন। বাবর রচিত আত্মজীবনী 'বাবর-নামা' চাঘতাই-তুর্কি ভাষায় লিখিত হলেও তা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয় এবং সর্বযুগের সাহিত্য সম্ভারে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত হয়। প্রকৃতিপ্রেমী বাবর ভারতের নানা প্রকার প্রাণীকূল ও উদ্ভিদকূল দেখে আনন্দ লাভ করেন এবং তার বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। এই কারণে বাবরকে ভারতের 'প্রথম প্রাকৃতিক ইতিহাস বিজ্ঞানী' বলা হয়। আর আকবরের সময়ে রচিত 'পেইনটিংস অব দি বাবরনামা' গ্রন্থ বিশ্ব সভ্যতার এক অমূল্য শিল্প সম্পদ। বারো খণ্ডে রচিত 'হামজা নামা' পুঁথির ১,০০৪ পৃষ্ঠা চিত্র শিল্পীদের দ্বারা অংকিত হয়। 'আকবর-নামা' এবং ফারসি ভাষায় অনুদিত 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' গ্রন্থের পৃষ্ঠায় শিল্পীদের আঁকা ছবি হিন্দু ও মুসলিম শিল্পীদের যৌথ প্রয়াসের ফসল বলা যায়। দারা শুকো ইউরোপীয় শিল্পের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং তাঁর শিল্পীরা ইউরোপীয় শিল্পরীতির দ্বারা প্রভাবিত হন। জীবনধারার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুঘল ও রাজপুতদের মধ্যে যে সমন্বয় ঘটে তার প্রতিফলন চিত্রকলাতেও লক্ষ্য করা যায়। রাজপুত রাজদরবারের শিল্পীরা তাদের ঐতিহ্যগত ধারাকে আরও উন্নত করেন। হিন্দু ও মুসলিম রীতির সামঞ্জস্যপূর্ণ সংমিশ্রণ স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের এক উল্লেখযোগ্য দিক বলা যায়। ইন্দো-পারসিক শিল্পরীতির সমন্বয়কে অগ্রাহ্য করে কী মধ্যযুগের ভারতের শিল্পকলার ইতিহাস আলোচনা সম্ভব? এই ঐতিহ্যগত ধারার উত্তরাধিকারী তো সকল ভারতবাসীই।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সমন্বয়ী ধারার উদ্ভব ঘটে। প্রাক্-ইসলামীয় আরব দেশে সঙ্গীত তুলনামূলকভাবে উন্নত ছিল। রাজ্য জয়ের ফলে ইসলামের যখন বিস্তার ঘটে তখন বাইজানটাইন ও ইরানীয় সঙ্গীতের ওপর প্রাক্-ইসলামীয় আরবীয়-সঙ্গীতের প্রভাব পড়ে। সঙ্গীত বিষয়ক তত্ত্ব ও তাকে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রূপদানের বিষয়ে আরবি ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন দার্শনিক অল-কিন্দী, অল-ফারাবি ও ইবন সিনা। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে ফারসি ভাষায় সঙ্গীত সম্বন্ধে দুটো গ্রন্থ রচিত হয়। নৃত্যও একটি শিল্প হিসেবে স্বীকৃত ছিল। বারানীর বিবরণ থেকে তা জানা যায়। আমির খসরু (মৃত্যু ১৩২৫ খ্রি:) হলেন একজন বিখ্যাত কবি ও সুফী। তাঁর মতে, ভারতীয় সঙ্গীত অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক উচ্চ পর্যায়ের ছিল। উল্লেখ্য এই, আরবদের দ্বারা ইরান জয়ের আগেই পারসো-আরব এবং ভারতীয় সঙ্গীতের মিশ্রণ শুরু হয়। সাসানীয় রাজা বাহরাম গুর (৪২১-৩৯ খ্রিঃ) তাঁর রাজ্যে হিন্দুস্তান থেকে দশ হাজার সঙ্গীতজ্ঞ ও নৃত্যশিল্পী এনে কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপন করেন। তারাই জিপসীদের পূর্বপুরুষ, যারা পরবর্তীকালে বাইজানটাইন ও ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বহু হিন্দু সঙ্গীতজ্ঞ ও শিল্পী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। যদিও রাজদরবার থেকে সঙ্গীতজ্ঞদের ভরণপোষণ করা হত, তাহলেও বহু সঙ্গীতজ্ঞ সুফীদের সেবা করাই পছন্দ করেন। কারণ সুফীরা ছিলেন সঙ্গীতের গুণগ্রাহী পণ্ডিত। বহু বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ সুফী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে আয় করেন ও ধর্মীয় মর্যাদা লাভ করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুফী সাধকরা ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত ও কবিতাকে ফারসী ভাষায় রচিত সঙ্গীত ও কবিতা থেকে বেশি ফলপ্রসূ মনে করেন। অবশ্য পারস্য দেশীয় সঙ্গীত ও কবিতাকে কখনও অবহেলা করা হয়নি। প্রধানত আমির খসরুর প্রয়াসেই নতুন ধরনের সঙ্গীতের উন্নয়নের জন্য সুযোগ-সুবিধার দুয়ার খুলে যায়। সঙ্গীতের এই ধারাটিকে 'ইন্দো- পারসিয়ান' বলা হয়। আমির খসরু কর্ণাটক স্কুলের গ্রুপদী 'দাক্ষিণাত্য সঙ্গীত' গভীরভাবে অধ্যয়ন করে এই প্রাচীন ভারতীয় ধারার সঙ্গীতের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ করেন।

ফিরোজ শাহর রাজত্বকালেও ভারতীয় ও পারস্য সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ অব্যাহত থাকে। গুজরাটের গভর্নর মালিক আবু রাজা উভয় সঙ্গীতের গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি তাঁর রাজদরবারে বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞদের আমন্ত্রণ করে ভারতীয় ও পারস্য সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনার বাবস্থা করেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর আঞ্চলিক রাজ্যের শাসকরাও সঙ্গীতের মস্তবড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৪২০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ 'সঙ্গীত শিরোমণি' জৌনপুরের ইব্রাহিম শাহ শারকির নামে উৎসর্গিত হয়। হোসায়ন শাহ শারকি (১৪৫৮-৭৯ খ্রিস্টাব্দে) একজন সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি সঙ্গীতের স্বরগ্রামের উচ্চতাদির মান, সুর ইত্যাদি বিষয়ে যেসব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন তা হোসায়নি অথবা জৌনপুরি ঘরানা নামে খ্যাত। তিনি 'খেয়াল'-এরও উন্নতি সাধন করেন। কাশ্মীরের সুলতান জয়নুল আবিদিনও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তার উৎসাহে 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থের উপর টীকা সংকলিত হয়। গোয়ালিয়রের রাজা মান সিংহ টোমার (১৪৫০-১৫২৮ খ্রি:) কেবলমাত্র সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না, তিনি নিজেও একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি ধ্রুপদ সঙ্গীতের হিন্দিতে স্বর পরিবর্তন করান। ধ্রুপদের

● এগারো পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

দৃশ্যপটের আড়ালে, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০

করোনা অতিমারির সময়কালে অতিমারির ভয়াল পরিস্থিতির গর্ভে দেশের আমজনতার চোখের আড়ালে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও আইনগত পরিবর্তনগুলির সাথে সাথে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল দেশের শিক্ষানীতিতে। যদিও এই পরিবর্তনের সূচনা ঘটেছে আরও কিছু দিন পূর্বেই। তবু অতিমারির মুখোশের আড়ালে বিশ্বায়ন ও সাম্প্রদায়িকতার যুগলগ্রাসে এই পরিবর্তন এক ভিন্ন মাত্রা নিয়ে হাজির হয়েছে দেশবাসীর সামনে। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস হল অন্য যে কোনোও দেশের মতোই, রাষ্ট্র-নিয়ামকদের আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থ দ্বারা নির্ধারিত মানব সম্পদ উৎপাদনের ইতিহাস। কোন শিক্ষা, কতজন, কতখানি পাবে—এই মৌলিক প্রশ্নগুলি নিয়ে রাষ্ট্র-নিয়ামকদের স্বার্থের সঙ্গে জনস্বার্থের রয়েছে চিরন্তন দ্বন্দ্ব, আজও তার পরিবর্তন ঘটেনি। আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে তুরস্কের তৎকালীন সরকার নতুন শিক্ষানীতির প্রস্তুত করার লক্ষ্যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জন ডিউ-র (John Dewey) সাহায্য চাইলে তিনি বলেন "শিক্ষানীতির পরিবর্তন করতে গেলে প্রথমেই পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন নতুন শিক্ষার উদ্দেশ্য কী, নতুন প্রজন্মকে এই নতুন শিক্ষার মধ্য দিয়ে সরকারের কোন উদ্দেশ্য সাধিত হবে সেটা পরিস্কার করা প্রয়োজন"। সুতরাং শিক্ষানীতি ২০২০ নিয়ে আলোচনা করতে চাইলে এই প্রসঙ্গটাই সব থেকে জরুরী, দেশের সরকারের উদ্দেশ্য কী?

সমগ্র প্রাণীজগতেই মা-বাবা তাদের শাবকদের কিছু না কিছু শেখায়, প্রকৃতির মধ্যে নিত্য নতুন পরিস্থিতিতে প্রতিকূলতার মধ্যে বাঁচার ক্ষেত্রে মা-বাবাই হল এই শাবকদের শিক্ষাগুরু, যা তারা শিখেছিলেন তাদেরই মা-বাবাদের কাছ থেকে। দীর্ঘ দিন ধরে প্রকৃতির পরিবর্তনের কারণে প্রাণীজগতের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাদের আচার-আচরণের ও জীবনধারণের পরিবর্তন ঘটলেও সেই পরিবর্তনগুলি শেখার জন্যে মা-বাবাই হল প্রাণী জগতের একমাত্র মাধ্যম। কিন্তু এক মানব সন্তান এই প্রাণী জগতের অংশ হিসাবে মা-বাবার কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করলেও তার জীবন ধারণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রসঙ্গটা একটু জটিল। কারণ মানুষ সমাজবদ্ধ জীব এবং এই সমাজও অনড়, অচল বা অপরিবর্তনশীল নয়। একটি মানব সন্তান তার বড় হয়ে ওঠার পথে প্রাথমিক শিক্ষা তার মা-বাবার কাছ থেকে পেলেও ধীরে ধীরে এই সমাজ ও পারিপার্শ্বিক পৃথিবী থেকেও শেখে অনেক বেশী। তাই এই সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজের কর্তৃত্বকারী প্রভুদের স্বার্থেই এই মানব শিশুর বেড়ে ওঠা ও শিক্ষা গ্রহণ। তাই সমাজের কর্তৃত্বকারী শাসকের স্বার্থেই কোন মানব শিশু কী শিখবে, কতটুকু শিখবে তা নির্ধারিত হয়। স্বাভাবিক কারণেই যেকোনো দেশের শিক্ষানীতি কতটা প্রাসঙ্গিক, কতটা কার্যকরী তা বোঝার আগে চেনা প্রয়োজন সমাজের কর্তৃত্বকারী শাসককে।

কেমন ছিল ভারতবর্ষের প্রাচীণ শিক্ষা ব্যবস্থা?

প্রাচীন ভারতের বেদভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বৈদিক শিক্ষা নামে অভিহিত করা হয়। 'পরম জ্ঞানলাভ' এবং 'পার্থিব দায়িত্ব পালনের শিক্ষা' এই দুটি বিষয় ছিল প্রাচীন যুগের বৈদিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এই সময়ে বৈদিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল গুরুগৃহ বা গুরুকুল বা গুরুর আশ্রম। উপনয়ন অনুষ্ঠানের পর শিষ্যরা স্থায়ীভাবে বসবাসের এবং শিক্ষালাভের জন্য গুরুকুলে হাজির হত। এক-একটি স্থানে এক-একজন গুরুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত বৈদিক শিক্ষার আবাসিক আশ্রম গুরুকুল এবং এই পর্যায়ে শিক্ষা শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ বর্ণের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিলনা কিন্তু সেই শিক্ষা ছিল সীমিত ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ। বৈদিক শিক্ষার পাঠক্রমে মূল বিষয় ছিল বেদ পাঠ ও বেদ অনুশীলন। বেদ ছাড়াও আরও কতকগুলি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পারদর্শী করে গড়ে তোলা হত। এগুলি হল—তর্ক, ছন্দ, ব্যাকরণ, কল্প, শিক্ষা, জ্যোতিষশাস্ত্র ইত্যাদি।

বৈদিক যুগে মহিলারা যথেষ্ট স্বাধীনতা পেতেন। তাঁরা শিক্ষা অর্জন করতে পারতেন, যাগযজ্ঞেও অংশগ্রহণ করতে পারতেন। এমনকি তাঁরা বৈদিক জ্ঞান অর্জন করার অধিকারীও ছিলেন। মুনি ঋষিদের কন্যারা আবাসিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমপরিমাণ বিদ্যা অর্জন করতে পারতেন। ২০০ খ্রীষ্ট পূর্বের আগে উপনয়ন মেয়েদের ক্ষেত্রেও বহুল প্রচলিত ছিল। এর নমুনা আমরা পাই বানভট্টের লেখা "কাদম্বরী" তে মহাশ্বেতা চরিত্রে। মেয়েদের শুধুমাত্র পৈতে পরার অধিকারই ছিল না, গুরুভাইদের সঙ্গে বেদ, বেদাঙ্গ পাঠ করার সুযোগও ছিল সমান। মাধবাচার্যের লেখাতে ছেলেদের মতই ৮ বৎসরে মেয়েদের উপনয়নের উল্লেখ পাওয়া যায়। জ্ঞানী মহিলাদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হত, যেমন "ঋষিকা" (অর্থাৎ যিনি ঋষিদের মতই মন্ত্রস্রষ্টা হওয়ার অধিকারিণী) "ঋত্বিকা" (যিনি যজ্ঞের অধিকারিণী) "ব্রহ্মবাদিন" (যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন), "মন্ত্রনীদ" বা "মন্ত্রদৃক" (যিনি মন্ত্র বা বৈদিক জ্ঞান অর্জন করেছেন) "পণ্ডিত" ইত্যাদি।

এই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে প্রাচীন ভারতবর্ষে জ্ঞানচর্চা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেমন দর্শন, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় থাকতো, তেমনি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছিল এই সময়ে। শুধুমাত্র ভাববাদী দর্শন নয়, একইসঙ্গে বস্তুবাদী চিন্তাধারা, নাস্তিক্যবাদ, ন্যায় শাস্ত্র ইত্যাদিতে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটে। জ্ঞানের

সুমন কান্তি নাগ

দিগন্ত প্রসারিত করার পূর্বশর্তের কারণে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, যাগযজ্ঞ, সামাজিক প্রথা ইত্যাদিকে প্রশ্ন করার সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। এই সময়ের বিজ্ঞানের অগ্রগতি ছিল বিস্ময়কর। পশ্চিমী দেশের আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার জন্মে অন্তত দেড় থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রের হাতে কলমের পরীক্ষা নির্ভর, আধুনিক বিজ্ঞানের সত্য অন্বেষনের পদ্ধতির (Modern Scientific Methodology) প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই। মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পা সভ্যতার সময় থেকেই আমাদের দেশে জ্যামিতি চর্চার ঐতিহ্য, পরবর্তীতে পাটিগণিত, বিশেষত সংখ্যা গণনের পদ্ধতি (শূণ্যের আবিস্কার ও দশমিক পদ্ধতির প্রয়োগ), জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি একজন ভারতীয় হিসাবে আমাদের অবশ্যই গর্বিত করে।

কোথায় হারিয়ে গেল এই বিজ্ঞানচর্চার পরম্পরাঃ

এই অন্বেষন করতে গিয়েই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভারতের বিজ্ঞানের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় রচনা করেন (হিন্দু রসায়নের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড—১৯০২ সাল)। পোড়া মাটির পাত্র তৈরি, আকরিক থেকে ধাতু আহরণ, কাপড়ে রঙের ব্যবহার, মদ প্রস্তুত করা, ঔষধ প্রস্তুত করা, সুগন্ধি প্রস্তুতসহ বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে ভারতে রসায়নের অগ্রগতির এক বিশাল ক্ষেত্র তিনি উন্মোচিত করেন, একই সাথে তিনি এই বিজ্ঞানচর্চার অগ্রগতিতে ছেদের কারণও সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেন। এই কারণের প্রথমটি ছিল জাতিভেদ প্রথা, দ্বিতীয়টি ছিল শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ। তিনি উল্লেখ করেন এই জাতিভেদপ্রথা বা বর্ণাশ্রমপ্রথা ও মায়াবাদ (ভাববাদ বা আরও নির্দিষ্ট করে ব্রাহ্মণ্যবাদ) কায়িকশ্রম ও মানসিকশ্রমের মধ্যে বিচ্ছেদ তৈরি করে। এর মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্যের সর্বনাশ হয়েছে। খুব স্বাভাবিক কারণেই এই জ্ঞানচর্চার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের হারিয়ে যাওয়ার কারণ খোঁজার সুযোগ নিয়ে যাদের জন্য এই সর্বনাশ (মণুবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদ, মায়াবাদ ইত্যাদির প্রবক্তা) তারাই অত্যন্ত সংগঠিতভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করে নবীন প্রজন্মকে বিপথে চালিত করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে দেশের শিক্ষানীতিকে ব্যবহার করে।

এখন প্রশ্ন হল, তাহলে কি শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই এই উলটপুরাণ ঘটেছে, উন্নত পশ্চিমী দুনিয়ায় কি সেখানকার মানুষকে এই সমস্যার সম্মুখীণ হতে হয়নি? না, তা তো নয়। সূর্য অস্তমিত হলে সব স্থলেই অন্ধকার নেমে আসে, উন্নত পশ্চিমী দুনিয়ায়ও এটা ঘটেছিল। এটা ঠিক যে পৃথিবীর প্রথম বৈজ্ঞানিক হিসাবে যাঁকে চিহ্নিত করা হয় তার নাম থেলিস, এক গ্রীক পণ্ডিত। তিনিই প্রথম ঘোষনা করে সূর্যগ্রহণ দেখিয়ে ছিলেন (যদিও মিশর বা ভারতবর্ষে তার আগেই এই কাজ সম্পন্ন হয়েছে)। সেই উন্নত দুনিয়াতেই মধ্যযুগেই এই বিজ্ঞানচর্চা এমন এক যায়গায় নেমে আসে যে পণ্ডিত মানুষ স্কলার (Scholar) একটা সময়ে আক্ষেপ করে বলেন -এমন একটা যুগে আমরা বাস করছি সেখানে বন্ধুকে যদি বলি ঘোড়ার কয়টি দাঁত রয়েছে, তাহলে সেই বন্ধু সামনের ঘোড়ার দাঁত গোনার পরিবর্তে লাইব্রেরীতে দৌড়াবে পুঁথিপত্রে পণ্ডিতরা এসম্পর্কে কি বলেছেন তা জানতে। অর্থাৎ যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানচর্চার পরিবর্তে শক্তিশালী হয় ভাববাদ। সৌরজগতের ক্ষেত্রে টলেমির (Ptolemy) ভূকেন্দ্রীক মডেলের পরিবর্তে কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রীক মডেলকে সমর্থন করার জন্য গ্যালিলিওর মতো বিদগ্ধ জ্ঞানী মানুষকেও তা টের পেতে হয়েছিল তাঁর জীবন দিয়ে। আবার ঘড়ি আবিস্কারের প্রসঙ্গে কি বিপত্তি হয়েছিল তা যদি ভাবি, সেসময়ে মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হত চার্চের ঘন্টাধ্বনি শুনে, ঘড়ি আবিস্কারের পরে চার্চের ঘন্টাধ্বনি শোনার প্রয়োজন হল না, এ এক মহা বিপত্তি। চার্চের নিয়ন্ত্রণ থাকছেনা ফলে ঘড়ি ব্যবহারের সাথে দ্বন্দ শুরু হয় চার্চের। আর মধ্যযুগের এই অবস্থার অবসান ঘটেছিল পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করে পুঁজিবাদের হাত ধরে রেনেসাঁর মধ্য দিয়ে। এই সময়ে সামাজিক চাহিদা ও মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন ঘটে যার সাথে সঙ্গতি রেখেই উন্নত পশ্চিমী দুনিয়ায় নতুন শিক্ষাব্যবস্থার জন্ম ও অগ্রগতি। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে সমস্যা হল এখানে পুঁজিবাদের পথ চলা সামন্ততন্ত্রকে উৎপাটন করে নয়, তার হাত ধরে। তাই এক জটিল রাষ্ট্র ব্যবস্থা আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তৈরি করে প্রতিবন্ধকতা।

তাহলে কি বলা যায় মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে আসা বৃটিশ শাসকদের হাত ধরে আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি ঘটেছিল? একথা সম্পূর্ণত অস্বীকার করা যাবে না, তবে একথা বলা যায় যে ভারতবর্ষের মতো এতবড় দেশকে শাসন করার জন্য যে সংখ্যক শিক্ষিত কর্মচারী প্রয়োজন তার অভাব মেটাতেই মূলতঃ ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক কারণেই ইংরাজি ভাষা, দর্শন, সাহিত্য ও আইন শিক্ষার ব্যবস্থা করে বৃটিশ সরকার। কিন্তু এই দেশের মানুষের বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজন তাদের কাছে না থাকার কারণেই প্রয়োজনীয় ব্যয়ের তুলনায় ভগ্নাংশ ব্যয় বৃটিশ শাসকেরা করেছেন। বৃটিশ শাসকের স্বার্থ কী ছিল তা দেখানোর জন্য একটা উদাহরণই যথেষ্ট। আমাদের দেশে বৃটিশ শাসক জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া, বোটানিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া, জুলজিকাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া ও অ্যান্থ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়ার মতো বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিল তা ঠিকই, কিন্তু স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরিকল্পনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তরস্তরে বিজ্ঞান চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য তারা করেনি। এখানেই শাসকের স্বার্থের সাথে শিক্ষানীতির সম্পর্ক। পরাধীন ভারতবর্ষে যতটুকু বিজ্ঞানশিক্ষার সুযোগ তৈরি হয়েছিল তার প্রায় সবটাই হয়েছিল দেশীয় মানুষদের উদ্যোগের পাশাপাশি কিছু বিদগ্ধ ইউরোপীয় শিক্ষাবিদদের উদ্যোগে। আর এই প্রসঙ্গগুলিকে বিবেচনায় নিয়ে স্বাধীন ভারতের সরকারগুলি বেশ কয়েকটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে। এই কমিশনগুলির যে অভিজ্ঞতা ও সুপারিশগুলি ছিল তার মূল ভাবনার কেন্দ্রে ছিল বেশ কিছু প্রসঙ্গ, কিন্তু প্রতিটি কমিশন কয়েকটি প্রসঙ্গে সহমত প্রকাশ করেছিল, তাহলো শিক্ষার উদ্দেশ্য (প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত) হবে একটি গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সমস্তরকমের কুসংস্কার মুক্ত এবং দ্ররিদ্র, অনাহার, অজ্ঞানতা ও বৈষম্যমুক্ত ভারতবর্ষ গঠন করার লক্ষ্যে। যেখানে মানুষ নির্ভয়ে তার মতামত প্রকাশ করতে পারবে, পারস্পরিক আলোচনা, বিতর্ক, প্রয়োজনে দ্বিমত প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে সত্য অন্বেষন। আরও বেশ কিছু প্রসঙ্গে সহমত প্রকাশ করেন কমিশনগুলির পক্ষ থেকে। প্রথমতঃ শিক্ষা মানুষের একটি মৌলিক অধিকার, শিক্ষা হবে সর্বজনীন, প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার দায়িত্ব সরকারের, শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা (অন্তত বিদ্যালয়স্তর পর্যন্ত)। এই প্রসঙ্গগুলিকে বিবেচনায় নিয়ে স্বাধীনত্তোর ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্তার যতই ত্রুটি বিচ্যুতি থাকুক খণ্ডিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জ্ঞানচর্চার অগ্রগতি ঘটেছে উল্লেখযোগ্য ভাবে। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষের দিকে আমাদের দেশে নব্য উদারনীতির সূচনাকাল থেকে শিক্ষা ব্যবস্থার বিকৃতিগুলিকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে থাকি। শিক্ষার দায়িত্ব থেকে সরকারের সরে আসা ও শিক্ষার বানিজ্যিকীকরণ শুরু হয়, যে ভাবনার মূল লক্ষ্যই ছিল শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ মৌলিক অন্যান্য পরিষেবার দায়িত্ব থেকে সরকারের হাত গুটিয়ে নেওয়া। এই বানিজ্যিকীকরণের সব থেকে কুৎসিত দিকটি হল এই সময় থেকে একজন শিক্ষার্থীও নিজেকে পণ্য হিসাবে গণ্য করতে শুরু করেছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য যখন হওয়া উচিৎ pursuit of knowledge অর্থাৎ জ্ঞানের সাধনা, তখন তার পরিবর্তে হয়ে দাঁড়ায় pursuit of money অর্থাৎ অর্থের সাধনা। এই শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষই হল বিভিন্নকাজে দক্ষ (skill base) কিছু তরুণ-তরুণী তৈরি করে বাজারে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি কর। যারা হবে আত্মকেন্দ্রীক ও একই সাথে তাদের নিজেদের এই দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে অর্থ উপার্জন। এটা ঠিক যে একটি দেশের অগ্রগতির জন্য যেমন জ্ঞানের (knowledge) প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন দক্ষতার (skill), দুটিই প্রয়োজন। কিন্তু আজকের ভারতবর্ষে এই দুটির মধ্যের পার্থক্যকে ভুলিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা শুরু হয়েছে। একদিকে যেমন প্রাথমিকস্তর থেকে শিক্ষার দায়িত্ব থেকে সরকার হাত গুটিয়ে নিচ্ছে, তেমনি উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিসহ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে অনুদান ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে, আর বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে দক্ষ মানব সম্পদ (প্রকৃতপক্ষে skilled labour) তৈরি করার।

নয়া শিক্ষানীতি ২০২০-র প্রেক্ষাপটঃ

বিগত এক দশকের নবতম সংযোজন হল ইতিহাসের বিকৃতি ও শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ। আগামী ২০২৫ সালে আর এস এসের জন্মশতবর্ষের লক্ষ্য হল আমাদের দেশকে একটি 'হিন্দুরাষ্ট্র' হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সংঘ

● অষ্টম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

ন্যাশনাল কাউন্সিল সভা

চলছে চলবে' প্রভৃতি।

এই সুবিশাল মিছিল প্রায় আধঘণ্টা পরিক্রমা করার পর এসে পৌঁছায় সভাস্থলে। সেখানেই সুউচ্চ বেদীর উপরে তৈরি করা হয়েছিল শহীদ বেদী। রক্তপতাকা উত্তোলন এবং শহীদবেদীতে মাল্যদানের কর্মসূচীটি পালিত হয় এই স্থলে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য সুমিত ভট্টাচার্য। প্রথমেই সংগঠনের রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সভাপতি সুভাষ লাম্বা। বিভিন্ন স্লোগান ওঠে। এ. শ্রীকুমার স্লোগান দেন 'Up Up red flag', 'AISGEF জিন্দাবাদ' প্রভৃতি। তিনি রক্তপতাকাকে সকলকে অভিবাদন করতে বলেন। এই রক্তপতাকা দুনিয়াজোড়া শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যকে প্রতিফলিত করে। এরপরে শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন সুভাষ লাম্বা। বেজে ওঠে ফরাসী বিপ্লবের সময় তৈরি হওয়া 'La Mercie' এর সুরের মূর্ছনা। এর পরবর্তীতে শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন, এই সভার উদ্বোধক তথা প্রখ্যাত আইনজীবী তথা রাজ্যসভার সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি তথা প্রখ্যাত চিকিৎসক ও সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্ব ডঃ ফুয়াদ হালিম এরপরে মাল্যদান করেন। একে একে এরপর মাল্যদান করেন এ. শ্রীকুমার, AISGEF-এর কোষাধ্যক্ষ শশীকান্ত রায়, বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী এবং সন্দীপ রায়। AISGEF-এর প্রাক্তন সহ-সম্পাদক তথা প্রাক্তন সহ-সভাপতি স্মরজিৎ রায়চৌধুরীর মাল্যদানের সাথে শেষ হয় এই কর্মসূচীটি।

প্রতিনিধি অধিবেশন

সাধারণ সম্পাদক তাঁর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করার পর তার ওপরে অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে মোট ৭২ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেছেন প্রায় দুই দিন ধরে। আলোচনায় যেমন এসেছে তাঁদের স্থানীয় সমস্যার কথা, তেমনই এসেছে সর্ব-ভারতীয় সমস্যাগুলির কথাও। সারা দেশের কর্মচারীদের মধ্যে দেখা গেছে অপেক্ষাকৃত শান্তিতে আছেন কেরলের কর্মচারীরা। সেখানে রাজ্য তালিকাভুক্ত যেসব ক্ষেত্র, সেগুলি সব চাইতে সমস্যামুক্ত, কিন্তু যৌথ তালিকাভুক্ত ক্ষেত্রগুলির প্রায় সব কয়টাই কেন্দ্রের আক্রমণে বিপর্যয়ের মুখে। রাজ্য সরকার কোনোক্রমে ঠেকা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে সেগুলিকে এবং সেগুলির কর্মচারীদের। এ কারণেই কেরলের বর্তমান সরকারের স্থায়িত্বের দায়িত্ব সবাইকে নিতে হবে বলে মন্তব্য এসেছে সেখানকার সব বক্তার জবানিতেই।

প্রায় সব বক্তাই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন নয়া শিক্ষা ব্যবস্থার বিপদের কথা। সংবিধান অনুযায়ী এটি যৌথ তালিকাভুক্ত। সুতরাং এই ক্ষেত্রের অনেকটাই কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল। কেন্দ্রের সরকার আর এস এস-এর দর্শন অনুযায়ী শিক্ষাক্রম বানাতে গিয়ে এক দিকে যেমন ইচ্ছামতো ইতিহাসের বিকৃতি ঘটাচ্ছে, অন্য দিকে গোটা ব্যবস্থাটাকেই দুমড়ে মুচড়ে দিচ্ছে। ওড়িশার বক্তা আবার এর সাথে যুক্ত করেছেন সাংস্কৃতিক বিকৃতির প্রসঙ্গও। সরকার যেমন পাঠক্রমের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে আর এস এস-এর দর্শন অনুযায়ী, আর এস এস নিজেও তেমনই তাদের কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে সারা দেশের যুব সমাজের একটা বড়ো অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিকৃতির বীজ বপন করে চলেছে। ফলে একটা সময় পর্যন্ত দেশে যে সামাজিক সুস্থিতি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আবহাওয়া বিরাজ করতো, এদের হাতে পড়ে তা এখন উধাও হতে বসেছে। এর বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধের ডাক দেন তিনি।

খুব স্বাভাবিক ভাবেই অসমের বক্তা তাঁর বক্তব্যে সি এ এ-র প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। অসম সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের ধারা অনুসরণ করে মানুষের কথা না ভেবে যে শুধু কর্পোরেটের কথাই ভাবছে, সে কথা বলে তিনি এর সার্বিক প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তার কথা জানান। স্মার্ট মিটার বসানোর জন্য অসম সরকারের তীব্র আকাঙ্খার কথা উল্লেখ করে এই মিটারের বিপদের দিকগুলি তিনি প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে এর বিরুদ্ধে সেখানে শিক্ষক এবং সরকারী কর্মচারীরা যৌথ আন্দোলন গড়ে তুলছেন। এই রাজ্যে তথাকথিত 'হিন্দুত্ব'র বিপদও তুলে ধরেছেন বক্তারা।

অন্ধ্রের এক বক্তা যা বললেন তা আসলে গোটা দেশেরই সমস্যা। গোটা দেশেই এখন জিনিসপত্র, বিশেষ করে খুচরো জিনিসের দাম বাড়ছে হু হু করে, অথচ চাষীরা সেই বর্ধিত মূল্যের অংশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অবিলম্বে এর সুরাহা করতে না পারলে এক দিকে যেমন উপভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, অন্য দিকে ক্রমাগত ক্ষতির সম্মুখীন হতে হতে চাষীরাও এক সময়ে তাঁদের উৎপাদনে আগ্রহ হারাবেন, ফলে একটা সময় এমন আসবে, যখন খাদ্য দ্রব্যের জন্যে দেশে হাহাকার পড়ে যাবে। সার্বিক আন্দোলন চাই তাই দেশের কর্পোরেটমুখী সরকারের বিরুদ্ধে। এই রাজ্যেরই অপর এক বক্তা কাউন্সিলের সামনে তুলে ধরলেন কি ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার ভাইজাগ স্টীল প্ল্যান্টের এক বিশাল পরিমাণ (২০,০০০ একর) জমি জলের দরে (মাত্র ১১,০০০ কোটি টাকা) 'পসকো''র হাতে তুলে দিতে চলেছে, অথচ এই সমুদায় জমিই স্টীল প্ল্যান্টের জন্যে সেখানকার কৃষকেরা দান করেছিলেন। আসলে এটা এক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা, অথচ সেটাই ক্রমান্বয়ে করে চলেছে নরেন্দ্র মোদির সরকার।

অন্য একটা দিকও উঠে এসেছে তাঁর কথায় আর সেটা হলো সেখানকার কর্মচারী প্রসঙ্গ। অন্ধ্র সরকার কর্মচারীদের পে-রিভিশনের প্রতি উদাসীন ছিল। আন্দোলনের পথে গিয়ে কর্মচারীরা এক লক্ষ লোকের মিছিল সংঘটিত করেন। নড়ে বসতে বাধ্য হয় অন্ধ্র সরকার। সংগ্রামী কর্মচারীরা ছিনিয়ে এনেছেন পে-রিভিশন, আদায় করেছেন ২৩-২৭ শতাংশ ফিটমেন্টও। সেখানে জি পি এফ থেকে ঋণ দেওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সাড়ে চার বছরের আন্দোলন এখন ঋণের রাস্তা খুলে দিয়েছে। সেখানে এখন ফিরে এসেছে 'গ্যারান্টিড পেনশন স্কীম' বা পুরাতন পেনশন ব্যবস্থা। পি এফ আর ডি এ-র জায়গা সেখানে এখন আস্তাকুঁড়ে।

অন্যান্য রাজ্য থেকেও যাঁরা বক্তব্য রেখেছেন, তাঁদের সবারই বক্তব্য এই ধারাতেই হয়েছে। এমন কোনও রাজ্যই দেখা যায়নি, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার বা তার কোনও স্কীমের প্রতি বিন্দুমাত্র কারুর সহানুভূতি আছে। সমস্ত বক্তাই কেন্দ্রের প্রতি তিতিবিরক্ত। মূল্যবৃদ্ধির দাপটে (যার জন্যে অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারই মূলতঃ দায়ী) সবারই প্রায় দিশাহারা অবস্থা। শিক্ষা নিয়ে উৎকণ্ঠা সবারই মধ্যে দেখা গিয়েছে এবং সবাই-ই চান নতুন পেনশন স্কীম বাতিল করে আবার পুরানো পেনশন স্কীমে ফিরে যেতে। কয়েকটি রাজ্য ইতোমধ্যেই ফিরে গিয়েছে বা ফিরে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, বাকিদের প্রস্তাব পুরানো স্কীমে ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্যে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার।

কাউন্সিলের গোটা বক্তব্য শোনার পর এটা বোঝা যায় যে সমস্ত রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থার মধ্যে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীরা। এ রাজ্যের থেকে বক্তব্য রাখতে উঠে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক দেবব্রত রায় বলেন, কর্ম-সংস্থানহীনতা, নৈরাজ্য, গুণ্ডামী এবং লাগামহীন স্বজন পোষণ প্রতিদিন এ রাজ্যের মানুষকে খাদের কিনারায় দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। তাঁদের ভোটাধিকার কার্যতঃ কেড়ে নিয়েছে শাসক দলের পোষা গুণ্ডারা। গণতন্ত্র এখানে বিপন্ন। আশার কথা, মানুষ এবারে মুখ খুলতে শুরু করেছেন। বিগত ১০ মার্চের অভূতপূর্ব সফল ধর্মঘট আন্দোলনের এক মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। মহার্ঘ ভাতা, শূন্যপদে লোক নিয়োগ এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে প্রায় একশো ভাগ কর্মচারী ওই দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। কর্মচারী সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চে গড়ে তুলে লাগাতার আন্দোলন চালানো হচ্ছে এখন। কর্মসূচীগুলিতে কর্মচারীদের অংশগ্রহণও ক্রমশঃ বাড়ছে। আমরা জানি, তৃণমূল বা বিজেপির কেউই মানুষের পক্ষে কাজ করে না এবং এদের দুই পক্ষের বিরুদ্ধেই লাগাতার আন্দোলন সংগ্রাম চালাতে হবে।

তিনি বলেন কেন্দ্রের মোদি সরকার আর রাজ্যের দিদি সরকার মুখে যাই বলুক, কাজে একই লাইনে চলেছে। সারা দেশে যেমন প্রায় সমস্ত সরকারী সম্পত্তি আদানিদের হাতে তুলে দিচ্ছে মোদির সরকার, এখানেও তেমনই দিদির সরকার সরকারী সম্পত্তি আদানিদের হাতে তুলে দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি দেউচা পাঁচামির বৃহত্তম কোল ব্লক তুলে দেওয়া হয়েছে আদানিদের হাতে সমস্ত আপত্তিকে উপেক্ষা করেই। মানুষের অসুবিধে কিংবা প্রকৃতির অসুবিধে কোনও কিছুকেই পাত্তা দিতে রাজি নয় এখানকার সরকার ঠিক কেন্দ্রীয় সরকারেরই মতো।

এখানকার সরকারও ঠিক কেন্দ্রের মতোই কর্মচারী বিরোধী। শুধু বিপুল পরিমাণে মহার্ঘ ভাতা বাকি রেখে দেওয়াই নয়, এখানে কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক অধিকারও কেড়ে নিতে মরিয়া সরকার। সরকার চায় কী কর্মচারী, কী সাধারণ নাগরিক সবাই-ই সরকারের প্রধানের মুখাপেক্ষী কিংবা কৃপাপ্রার্থী হয়েই থাকুক। "হক আর ভিখ্", এই দুটোকে একাকার করে দেওয়া হয়েছে এখানে। এই কারণেই বেকারদের চাকরি দেওয়ার পরিবর্তে মাসে পাঁচশো টাকার ভিক্ষা দিতেই ব্যস্ত রাজ্য সরকার। দুজনের বিরুদ্ধেই সার্বিক লড়াইয়ের ডাক দেন তিনি।

এ ছাড়াও বক্তব্য রেখেছেন পঞ্চায়েত যৌথ কমিটির পক্ষে পিনাকীব্রত সজ্জন। কাউন্সিলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রেখেছেন সারা ভারত পেনশনার্স ফেডারেশনের পক্ষে অরুণা ঘোষ, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের পক্ষে রূপক সাহা, পূর্ব রেল কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষে সুশান্ত গাঙ্গুলী প্রমুখ। অন্যান্য বক্তাদের মতো এনাদের বক্তব্যও একই সুরে বাঁধা ছিল।

প্রকাশ্য সমাবেশ

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয় বিধাননগরের পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রে (ই জেড সি সি অডিটোরিয়াম) ২৮-৩০ ডিসেম্বর। ৩০শে ডিসেম্বর জাতীয় কাউন্সিল সভা শেষে বিধাননগরের বৈশাখী আবাসনের নিকটে এএমপি মলের সামনে প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাশ্য সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি এস. লাম্বা। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডি. ওয়াই. এফ. আই. সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখার্জি। বক্তব্য রাখেন সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার। সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী এবং পঞ্চায়েত যৌথ কমিটির সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ রায়।

নয়া উদারনীতির প্রয়োগে দেশজুড়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে বেকার সমস্যা, বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে চলছে বেসরকারীকরণ, ঠিকাপ্রথায় দপ্তরগুলো চালাবার চেষ্টা করছে কেন্দ্রের সরকার। একই পথে চলছে পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের সরকার। বন্দর, বীমা, ব্যাংক থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারীকরণ করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্যব্যবস্থার মতো ক্ষেত্রগুলোতেও বেসরকারীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকারগুলোও একই পথে হাঁটছে। এর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কাউন্সিলসভা। কেন্দ্র এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলোর

● সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

ন্যাশনাল কাউন্সিল সভার সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর কিছু চিত্র

✦ ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পরে

ন্যাশনাল কাউন্সিল সভা

কর্মচারী স্বার্থবিরোধী, জনবিরোধী নীতি ও কাজের

মিছিল

বিরুদ্ধে যে নিরন্তর সংগ্রাম, আন্দোলন চলছে তা আরও তীব্রতর করার লক্ষ্যে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অন্যান্য কেন্দ্রীয় কর্মচারী সংগঠনের সাথে যৌথভাবে দেশব্যাপী ধর্মঘটে যাবার কথা জাতীয় কাউন্সিল সভার এই প্রকাশ্য সমাবেশ থেকে ঘোষণা করেন নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশের সভাপতিত্ব করতে গিয়ে তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে এস লাম্বা বলেন যে ১৯৯১ এর পর থেকেই কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন রাজ্যের সরকারগুলো নয়া উদারনীতির শর্ত মেনে সরকার চালাচ্ছে। বর্তমানে কেন্দ্রে কম্যুনাল-কর্পোরেট আঁতাতের সরকার চলছে। পশ্চিমবঙ্গেও একইভাবে চলছে। এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মুখে কেন্দ্রের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির বিরোধিতা করলেও আসলে নয়া উদারনীতির শর্ত মেনেই সরকার চালাচ্ছেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে এরাজ্যের কর্মচারীরা যখন এই নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে, এরাজ্যের বর্তমান সরকার সেই আন্দোলনের বিরোধিতা করে তাঁদের বিরুদ্ধে

পঞ্চায়েত যৌথ কমিটির পক্ষে পিনাকীব্রত সজ্জন

ব্যবস্থা নিয়েছে। শ্রমিক-কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, ধর্মঘট করার অধিকার এইরাজ্যের বর্তমান সরকার হরণ করছে। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার বলেন, এ রাজ্যের সরকারী কর্মচারী এবং শিক্ষক যেমন প্রাপ্য ডিএ থেকে বঞ্চিত, তেমনি এ রাজ্যের শিক্ষিত যুবসমাজও চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এ রাজ্যে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে আর কোনো নিয়োগ হয়না। পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে নিষ্ক্রিয় করে তোলা হচ্ছে। নিয়োগ নিয়ে দূর্নীতি হচ্ছে। ১৯৯১ সালের পর থেকেই নয়া উদারনীতির পথ ধরে রেগুলার, স্থায়ী নিয়োগ কমছে, বাড়ছে চুক্তিপ্রথায় নিয়োগ। কেন্দ্রীয় সরকার যেমন এই নীতি নিয়ে চলছে, একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডাউনসাইজিং অর্থাৎ কর্মী সংকোচনের পথে হাঁটছে, বেসরকারীকরণের পথে হাঁটছে। ডাউন সাইজিং বা কর্মী সংকোচনের অর্থ সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে সরে আসা। অধিকাংশ রাজ্যের সরকারও একই পথে হাঁটছে। উল্টোদিকে কেরালার এল ডি এফ সরকার এই নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেই একদিকে

স্মারক প্রকাশ করছেন বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

যেমন কর্মচারীদের স্বার্থ সুরক্ষিত করছে, অপরদিকে বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণের কাছে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা পৌঁছে দিচ্ছে। গৃহহীনদের জন্য প্রকল্প বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

পঞ্চায়েত যৌথ কমিটির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ রায় তাঁর বক্তব্যে ২০১১ সালের পর থেকে পঞ্চায়েত সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারীদের উপর যে প্রশাসনিক আক্রমণ নেমে এসেছে তার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন শারীরিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক আক্রমণ উপেক্ষা করেই যেভাবে এরাজ্যের সরকারী কর্মচারী, পঞ্চায়েত কর্মচারী, শিক্ষক সমাজ ২০১২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী থেকে ২০২৩ সালের ১০ মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছেন, আগামী দেশব্যাপী ধর্মঘটেও একইভাবে সাহসের সাথে অংশগ্রহণ করবেন। আগামী দেশব্যাপী ধর্মঘটের দাবীসমূহের মধ্যে এরাজ্যের বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদানের দাবীকে গুরুত্ব সহকারে স্থান দেবার আবেদন জানান সন্দীপ রায়। একইসাথে আগামী লোকসভা নির্বাচনে দেশের সরকারে যে কর্পোরেট-কম্যুনাল শক্তি ক্ষমতাসীন রয়েছে, তাকেও পরাস্ত করার আহ্বান রাখেন। সমাবেশ মঞ্চ থেকে সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন যে আমাদের লড়াই শুধু মহার্ঘভাতা আদায়ের লড়াই নয়, আমাদের লড়াই একদিকে যেমন প্রশাসনের অভ্যন্তরে যে আক্রমণ নেমে আসছে তার বিরুদ্ধে, একইসাথে প্রশাসনের বাইরে সাধারণ মানুষের উপর প্রতিনিয়ত যে আক্রমণ নেমে আসছে তারও বিরুদ্ধে। আমাদের লড়াই মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেবার বিরুদ্ধে, বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে, ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতির বিরুদ্ধে। আমরা কোনো দয়াদাক্ষিণ্যের উপর দাঁড়িয়ে লড়াই করিনা। আমাদের লড়াই অধিকার অর্জনের লড়াই, অধিকারের উপর যদি আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়, তাকে ছিনিয়ে নেবার লড়াই। এই লড়াইয়ের

মেডিকেল টিম

অংশ হিসেবে গত ১০ মার্চের ধর্মঘটে যেমন নবান্নের ১৪ তলাকে নাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, একইভাবে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে দেশের সংবিধান রক্ষার লক্ষ্যে, দেশের মানচিত্র অক্ষুণ্ণ রাখার লক্ষ্যে, শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে যে দেশব্যাপী ধর্মঘটের আহ্বান রাখা হয়েছে, সেই ধর্মঘটেও এরাজ্যের কর্মচারীসমাজ বড়ো ভূমিকা পালন করবেন। দেশে এবং রাজ্য গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে এরাজ্যের কর্মচারীসমাজও সামিল হবে, যতই প্রশাসনিক আক্রমণ নামিয়ে আনা হোক না কেন।

সমাবেশের প্রধান বক্তা ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখার্জি তার বক্তব্যে

পেনশনার্সদের কেন্দ্রীয় যৌথ মঞ্চের পক্ষে অরুণা ঘোষ

বলেন যে এই সময় রাজ্য প্রশাসনের অভ্যন্তরে সরকারী কর্মচারীদের সরকারী নীতির বিরুদ্ধে লড়াই, আন্দোলন করতে গেলে যে রসদ প্রথম প্রয়োজন হয় তা হলো সাহস। এই সাহসকে সেলাম জানাতেই হয়। তিনি বলেন যাঁরা হাল ছাড়েনা, তাঁদের সংগ্রামকে কেউ হারাতে পারবেনা। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের এই জানকবুল লড়াইয়ের পাশে ডি ওয়াই এফ আই-এর সংগ্রামও যুক্ত আছে। সরকারী কর্মচারী সংগঠনগুলো যে স্থায়ী পদে স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগের কথা বলে, শূন্যপদ পূরণের কথা বলে, চুক্তিপ্রথায় নিয়োজিত কর্মীদের স্থায়ীকরণের কথা বলে, এই দাবীগুলো যুব ফেডারেশনেরও দাবী। মীনাক্ষী আরও বলেন, সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার দাবী শুধু তাঁর একার দাবী নয়, এই দাবীর সাথে তাঁর পরিবার জড়িয়ে আছে। শিক্ষক, কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্তদের মহার্ঘভাতা নেই, স্থায়ী নিয়োগ নেই। এর প্রভাব পড়েছে স্থানীয় অর্থনীতিতে। বাজারের ক্রেতা কমে যাচ্ছে। নবান্নের ওপরতলার চুরিতে সাহায্য করার শর্তে ঠিকাকর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। আর টি আই করেও এই দেশের বা রাজ্যের সরকারের থেকে জানা যায়না যে কত মানুষ চাকরি পেয়েছে আর কত মানুষ বেকার। একাংশের বিডিও এবং পুলিশকর্মীদের ভূমিকাকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, গত ১২ বছরে পাঁচবার বিডিওদের বেতন বৃদ্ধি হয়েছে, অথচ সরকারী কর্মচারী তার প্রাপ্য মহার্ঘভাতা পাচ্ছেনা, চুক্তিপ্রথায় নিযুক্ত কর্মচারী তাঁর ন্যায্য বেতন পাচ্ছেনা। যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের ১০০০ এর বেশি দিন ধরে রাস্তায় অবস্থান করতে হচ্ছে। একজন প্রতিবাদী যখন তাঁর মাথার চুল কামিয়ে ফেলে প্রতিবাদে সামিল হোন, সে লজ্জা সারা রাজ্যবাসীর। তিনি বলেন প্রতিদিন কিছু স্বার্থান্বেষী মহল থেকে গোয়েবলসের মতো মিথ্যাচার করে সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে ভুল ধারণা তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে, কর্মচারীদের ভিলেন বানানোর চেষ্টা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধেও কর্মচারীদের প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হচ্ছে। তিনি তাঁর বক্তব্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সংস্থা বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সরকারী সংস্থাগুলো না থাকলে অনেক পরিবারে হয়তো উনুনে আগুন জ্বলবে কিন্তু হাড়িতে খাওয়ার জন্য ভাত থাকবে না। বঞ্চিত যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের মরিয়া সংগ্রাম এবং সরকারী কর্মচারীদের সংগ্রামের পাশে সকলকে দাঁড়ানোর আহ্বান

জাতীয় কাউন্সিল সভাগৃহ (ই জেড সি সি)

জানিয়ে তিনি বলেন, এই সংগ্রাম রাজ্যের মানুষের সংগ্রাম। মীনাক্ষী মুখার্জি ইনসাফ যাত্রার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, রাজ্যের সর্বত্র বিভিন্ন অংশের মানুষ তাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন, ফলে বিভিন্ন অংশের এবং প্রান্তের মানুষের দুর্দশা ও হাহাকার জানার সুযোগ হয়েছে। এরাজ্যের মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম চলছে। তিনি সব অংশের মানুষের দাবীকে যুক্ত করে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারী ব্রিগেড সমাবেশে সামিল হবার আহ্বান জানান।

সমাবেশ মঞ্চে জাতীয় কাউন্সিল সভার অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষ থেকে মীনাক্ষী মুখার্জিকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা জানান বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী এবং সন্দীপ রায়। যুবদের ইনসাফ যাত্রা এবং আগামী ৭ জানুয়ারীর ব্রিগেড সমাবেশের সাফল্য কামনা করে মীনাক্ষী মুখার্জির হাতে বিশ হাজার টাকা তুলে দেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। এছাড়াও মীনাক্ষী মুখার্জির হাতে পাঁচ হাজার টাকা তুলে দেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী শেখর রায়।

প্রকাশ্য সমাবেশের শুরুতে রেড ভলান্টিয়ারদের পক্ষ থেকে গণসঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

এই প্রকাশ্য সমাবেশের ব্যাপক জমায়েতে সরকারী কর্মচারীদের পাশাপাশি ছাত্র-যুব সহ স্থানীয় গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। □

সর্বাণী দে, দীপঙ্কর বাগচী, উৎসর্গ মিত্র

জাতীয় কাউন্সিল সভা উপলক্ষে বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ

গত ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ সল্টলেকের পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের

স্পেশাল সুভ্যেনির উদ্বোধন করছেন এ আই এস জি ই এফ-এর প্রাক্তন সহ সাধারণ সম্পাদক স্মরজিৎ রায় চৌধুরী

জাতীয় কাউন্সিল সভার উদ্বোধনী অধিবেশনে স্মারক সংখ্যা প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রাক্তন সহ সাধারণ সম্পাদক স্মরজিৎ রায়চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘আমি খুব খুশি হয়েছি আপনাদের মধ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য। সভায় কর্মচারীদের দাবি, অধিকার নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করতে হবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের সরকার নয়। পুঁজিপতিদের সরকার। ২০১৪ সালে নির্বাচনের পূর্বে বিজেপি যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছিল, বছরে ২ কোটি বেকারের চাকরি হবে। তাহলে গত ১০ বছরে ২০ কোটি চাকরি হওয়ার কথা। কত চাকরি হয়েছে? সরকারী ক্ষেত্রে লাখো লাখো শূন্যপদ রয়েছে। পূরণ করা হচ্ছে না। রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাগুলিকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। বেসরকারীকরণের মাধ্যমে কর্মচারী সঙ্কোচন করা হচ্ছে। নোটবন্দীর সময় থেকে মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে অদ্যাবধি সেটা চলছে গ্যাসে আধার লিঙ্ক করার জন্য। বলেছিল কালো টাকা উদ্ধার করবে। সেটা হয়নি। উল্টে আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, বেকার বিস্ফোরণ ঘটছে। সরকার মেহনতি মানুষের জন্য কিছু করছে না। সংবিধানকে পরিবর্তন করছে। দেশের বহুত্ববাদকে ধ্বংস করে বিভাজনের রাজনীতি করছে যাতে শ্রমজীবীরা ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে।’

তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গের সরকার দুর্নীতির সরকার। সারদা, নারদা, টেট সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি হচ্ছে। শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীরা জেলে রয়েছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে দিল্লী থেকে বিজেপি সরকারকে সরিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। হারাতে হবে এ রাজ্যের শাসক দলকেও। তার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

স্মরজিৎ রায় চৌধুরীর হাতে জাতীয় কাউন্সিল সভা উপলক্ষে মুদ্রিত বিশেষ স্মরণিকা উদ্বোধনের জন্য তুলে দেন দুই যুগ্ম-আহ্বায়ক মানস কুমার বড়ুয়া এবং উমাশঙ্কর দলপতি। □

বিদ্যুৎ দাস

এ আই এস জি ই এফ-এর প্রাক্তন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন

বিজয় শংকর সিংহ

রেবা মুখার্জী

ছবি ঘাটা হালদার

অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

অসিত ভট্টাচার্য

পঞ্চম পৃষ্ঠার পরে

দৃশ্যপটের আড়ালে, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০

পরিবার কতগুলি কৌশল গ্রহণ করে চলেছে। ১) প্রাচীণ ভারতের ইতিহাসকে সমালোচনা বিহীনভাবে গৌরবান্বিত করা। ২) কৃত্রিমভাবে দেশের সর্বত্র হোমোজিনিয়াস হিন্দু আইডেনটিটি গড়ে তোলা। ৩) জাতির সামনে উপস্থিত যেকোনো সমস্যার কারণ হিসাবে কমিউনিস্ট, মুসলিম ও খ্রীস্টানদের দায়ী করা। ৪) হিন্দুত্ববাদের সমালোচকদের ও মুসলিমদের দেশদ্রোহী ও পাকিস্থানপন্থী হিসাবে চিহ্নিত করা। ৫) অতীতের দেশের অভ্যন্তরের যেকোন ঘটনা বা পরম্পরা যা তাদের বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করে, তা বিদেশী ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত বামপন্থী ও উদারবাদী বুদ্ধিজীবিদের দ্বারা নির্মিত বলে প্রচার করা। আর এই জন্য প্রয়োজন নতুন প্রজন্মের কাছে এই প্রসঙ্গগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য এক উপযুক্ত শিক্ষানীতি। যা কর্পোরেট স্বার্থকে রক্ষা করবে, আবার 'হিন্দুরাষ্ট্র' গঠনের হিন্দুত্ববাদী দর্শনকেও প্রতিষ্ঠিত করবে দেশের যুব সমাজের মননে।

এই লক্ষ্যেই ৩১ মে ২০১৯ ডঃ কস্তুরীরঙ্গনের নেতৃত্বে একটি খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি প্রকাশিত হয়। প্রাথমিকভাবে এই শিক্ষানীতির উপর মতামত দেওয়ার জন্য একমাস সময় দেওয়া হয়। পরবতীতে বিভিন্ন মহল থেকে এই বিষয়ে সময় বাড়ানোর আর্জিতে সাড়া দিয়ে সময় আরো একবার বাড়ানো হয়। এই শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্যই হল শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন অর্থনৈতিক দায় না নিয়ে, কেন্দ্রীয় সংস্থা দ্বারা সর্বব্যাপী অনুশাসন। খুব স্বাভবিক কারণেই দেশের ৬৮ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ও সিংহভাগ বিদ্যালয় রাজ্যের নিয়ন্ত্রনে থাকা সত্ত্বেও এবং সংবিধানে শিক্ষার প্রসঙ্গটি কেন্দ্র রাজ্যের যৌথ তালিকায় থাকলেও শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে কোন মতামত রাজ্য সরকারগুলির কাছ থেকে নেওয়া হয়নি। এই দেশের মৌল কাঠামোগুলিকেই ধ্বংস করার যে হিংস্র আয়োজন চলছে, এটি তার একটি নিকৃষ্ট প্রমাণ। শিক্ষক সংগঠনগুলির কথা ছেড়ে দিলেও সারা দেশে মেডিক্যাল ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত ১৭টি কাউন্সিল থাকা সত্ত্বেও তাদের কাছে মতামত নেওয়া হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এটি, যখন কোভিড অতিমারীর ভয়াবহ কড়ালগ্রাসে সমগ্র বিশ্বের সাথে আমাদের সঙ্কটগ্রস্থ তখন দেশের সরকার সংসদকে এড়িয়ে ৪৯৪ পাতার এই শিক্ষানীতির ৬৬ পাতার নির্যাস "জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০" গ্রহণ করেছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর যে ৬৬ পাতার নির্যাসটি আমাদের হাতে এসেছে তার ছত্রে ছত্রে বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে। যা সাধারণ মানুষকে সত্যিই আকর্ষিত করবে। শুরুতেই বলা হয়েছে শিক্ষা হবে 'ভারতকেন্দ্রীক' এবং তার লক্ষ্য হবে 'নলেজ সোসাইটি' গড়ে তোলা। যদিও এই ভারতকেন্দ্রীক শব্দবন্ধ শুনতে খুব ভালো লাগলেও শিক্ষাবিদদের কাছে এর গভীরতা অনেক বেশি। শিক্ষা প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণত একটি বিশ্বজনীন প্রসঙ্গ। জ্ঞান কোন নির্দিষ্ট দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনা, তাহলে 'ভারতকেন্দ্রীক'-এই শব্দবন্ধের অর্থ কি? অর্থটি বোঝা যাবে সমগ্র শিক্ষানীতির মধ্য দিয়ে কী করতে চাইছে তার দিশা খুঁজে পেলেই। আমাদের দেশের অতীত গৌরব বলতে হিন্দুত্ববাদীরা বা হিন্দু সনাতনবাদীরা যা বোঝে তাকেই শিক্ষায় প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ বিজ্ঞান ও কাল্পনিকতার (Myth) এর মধ্যের পার্থক্যকে মুছে ফেলতে এই শিক্ষানীতিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

কাঠামোগত পরিবর্তন ও শিশু শিক্ষা ঃ

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে বলা আছে সব শিশু শিক্ষার সমান অধিকার পাবে। এখানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সময়কাল ৩ থেকে ১৮ বছর ধরা হয়েছে, এক্ষেত্রে বলা যায় পৃথিবীর যে কোনো দেশেই ৩ বছর বয়সে শিশুকে শিক্ষার অঙ্গনে টেনে আনার নজির নেই। রাইট টু এডুকেশন অনুসারে ৬ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষার দায়িত্ব সরকারের। প্রস্তাবে প্রচলিত ১০+২ এর পরিবর্তে ৫+৩+৩+৪ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে, যার মধ্যে প্রথম ৩ বছর শিক্ষা হবে 'বালবাটিকায়', বলা হয়েছে এখানে অতি উচ্চমানের, বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে যা হবে স্বপ্নের স্কুল। কিন্তু শিক্ষার দায়িত্ব থাকবে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের উপর, যাদের এই জন্য ছয় মাসের বিশেষ ট্রেনিং এর ব্যবস্থা থাকবে। যারা দেশের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির হালহকিকৎ জানেন তারাই বুঝতে পারবেন এর ভবিষ্যৎ কি। আমাদের দেশের পিছিয়ে পড়া মানুষের ৮০ শতাংশের বেশি গ্রামে অবস্থান করে, যাদের সিংহভাগটাই দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থান করে। ফলে এই অংশের প্রান্তিক পরিবারের ৩ বছরের শিশুকে স্কুলের দোর গোড়ায় নিয়ে আসাটাই বড় চ্যালেঞ্জ, তাকে স্বজ্ঞানেই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। শিক্ষা নীতির ৩.৫ ধারা অনুযায়ী যারা এই মূল ধারার শিক্ষায় প্রবেশ করতে পারবেনা তাদের জন্য অনলাইন বা ওপেন স্কুল ব্যবস্থায় শিক্ষাদানের ভাবনা রয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে অবাস্তব। খুব স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষা কাঠামোর শুরুতেই প্রান্তিক অংশের পরিবারের শিশুদের শিক্ষাঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতা শুরু হবে।

শিক্ষানীতির ১.৮ ধারা অনুযায়ী আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় শিশুদের জন্য আশ্রমশালা খোলার কথা বলা হয়েছে। যা প্রকৃতপক্ষে সমাজের প্রান্তিক অংশের ছেলে মেয়েদের মূলধারার শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রবণতাকে চিহ্নিত করছে। আর সাধারণ ক্ষেত্রে স্থানীয় বিদ্যালয়গুলির পরিবর্তে বিদ্যালয় কমপ্লেক্স গড়ে তোলার প্রস্তাব রয়েছে। ৩ থেকে ৫ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ পর্যন্ত বিদ্যালয়গুলিকে একত্রিত করে কমপ্লেক্সগুলি গড়ে তোলা হবে। এই বিদ্যালয়গুলিতে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ছাড়াও, বেসরকারি বিদ্যালয় ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিদ্যালয় সবই স্থান পাবে। এই প্রস্তাব কার্যকরী হলে বাসস্থানের নিকটবর্তী স্কুলে শিক্ষার সুযোগ কমবে, প্রান্তিক অংশের ছাত্ররা যাতায়াতের খরচ বাড়ার কারণে স্কুল ছাড়তে বাধ্য হবে। পাশাপাশি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে শিশু শিক্ষার দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার নামে সরাসরি আর. এস. এস. নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলিকেই আরও তীব্রভাবে তাদের কর্মসূচী প্রয়োগ করার জন্য ক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে।

সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হল, নতুন শিক্ষানীতির পরিবর্তনের কারণে প্রয়োজন বিপুল পরিমান আর্থিক অনুদান। এই নীতিকে কার্যকরী করতে সরকারি অনুদান দ্বিগুন করার দাবি করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটা কি? ২০১৯ সালের বাজেটেই বিদ্যালয় শিক্ষা অনুদান ২.০৫% থেকে কমিয়ে ২.০৩%-এ হ্রাস পেয়েছে। বাৎসরিক মূল্যবৃদ্ধি ৫.২৪% ধরলে বিগত বছরের তুলনায় এই হ্রাসের পরিমান ৭%। অর্থাৎ এই সনদে শিক্ষার ক্ষেত্রে দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্য রাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে যে দাবি শুরুতেই করা হচ্ছে তাকে সরাসরি খণ্ডণ করা হচ্ছে।

ত্রিভাষা সূত্রঃ

শিক্ষানীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে ২ থেকে ৮ বছরের শিশুরা খুব দ্রুত ভাষা শিখতে পারে। তাই শিক্ষার প্রারম্ভেই ৩ বছরের শিশুদের তিন-তিনটি ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানে পঞ্চমশ্রেণীর পরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের কোন সুযোগ রাখা থাকছেনা। এক্ষেত্রে ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, এই ত্রিভাষা সূত্রকে কার্যকরী করার মধ্য দিয়ে ভারতের সর্বত্র হিন্দীভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হিন্দি ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার অত্যুৎসাহ শিশুমনকে ক্লিষ্ট ও ভারাক্রান্ত করে তুলছে। এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য, তিনি স্পষ্টতই বলেছিলেন যে মাতৃভাষাকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর সহ উচ্চতর পর্যায়েও শিক্ষার বাহন করে তুলতে পারলেই প্রকৃত সর্বজনীন শিক্ষার বিস্তার ঘটবে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতেও এই প্রসঙ্গে একই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু এক দেশ, এক ধর্ম, এক ভাষা, এক খাদ্যাভ্যাস, এক সংস্কৃতি গড়ে তোলার কারিগড়েরা এই নীতির পরিপন্থী এক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইছেন।

সংরক্ষণ ব্যবস্থার অস্বীকৃতিঃ

শিক্ষানীতির ১৪.১ ধারায় আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করাই অগ্রাধিকার পাবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তার কথা উল্লেখ থাকলেও নির্দিষ্টভাবে 'সংরক্ষণ' কথাটির উল্লেখ শিক্ষানীতির এই দলিলে অনুপস্থিত। প্রাথমিক ধারণায় মনে হবে শিক্ষানীতির প্রবক্তারা একবারও ভাবেননি যে ভর্তির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ না থাকলে ভর্তির পরে আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়ার প্রসঙ্গটি আক্ষরিক অর্থেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। শুধুমাত্র তাই নয়, সমগ্র দলিলটিতে কোথাও এস.সি., এস.টি., ও.বি.সি. বা মাইনরিটি কথাগুলির উল্লেখ পর্যন্ত নেই। প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত পরিকল্পনা করেই দলিলে সংরক্ষণ কথাটি বাদ দিয়ে বারবার মেধাভিত্তিক স্কলারশিপ, মেধাভিত্তিক প্রমোশন, মেধাভিত্তিক নিয়োগ প্রভৃতি শব্দগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

কর্পোরেট স্বার্থে শিক্ষাকে গড়ে তোলাঃ

শিক্ষানীতির এই দলিলে আবশ্যিকভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে স্কুল শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়েছে। বৃত্তিগত ও প্রথাগত শিক্ষার পার্থক্য কমিয়ে আনার কথাও বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যারমধ্য দিয়ে বিদ্যাচর্চার মূল উদ্দেশ্যকে ভুলিয়ে দিয়ে শিক্ষাকে শুধুমাত্র অর্থ উপার্যনের মাধ্যম হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা শুরু হয়েছে। শিক্ষার সাথে যুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই জানেন, কোন একটি বিষয়ে তত্ত্বগতভাবে যদি সমৃদ্ধ ও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা না করা হয়, তবে তার প্রায়োগিক দিক যথাযথ হতে পারেনা। কিন্তু গোটা দলিলে এই প্রসঙ্গকে পরিকল্পিতভাবে সরিয়ে রেখে গোটা দলিল জুড়ে 'Multidisciplinary Approach' এর কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যা হল, 'Jack of all trades, master of none' এই ধরণের কিছু ছাত্র-ছাত্রী তৈরি করা। আগামী প্রজন্মের মধ্যে স্বকীয় ভাবনা ও বিশ্লেষণী শক্তির বিকাশ ঘটার ক্ষেত্রে অন্তরায় তৈরি করে প্রশ্নহীন আনুগত্যের একদল মানুষকে তৈরি করাই হল এই শিক্ষানীতির মূল দর্শন।

আর এই দর্শনের উপর ভিত্তি করেই সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাটাই তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে বেসরকারী হাতে। যেখানে বলা হচ্ছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যত খুশি খোলা হোক, কিন্তু তা খোলা হোক 'মানব কল্যাণ'-এর উদ্দেশ্যে। একদিকে বলা হচ্ছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে 'ফি নিজেদের মতো করে ঠিক কর' অর্থাৎ যতখুশি ফি নাও, আবার উল্টো দিকে বলা হচ্ছে 'যদি বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে কর তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হবে', কারণ 'শিক্ষা পণ্য নয়'। এমন সোনার পাথরবাটি কোথায় পাওয়া যায়?

শেষ পর্যন্তঃ

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বোঝা যাচ্ছে স্পষ্টতই এই শিক্ষানীতি সামগ্রিকভাবে শিক্ষা বিরোধী, ছাত্র-শিক্ষক- শিক্ষাকর্মী বিরোধী, দলিত আদিবাসীসহ সমগ্র প্রান্তিক অংশের মানুষের স্বার্থ বিরোধী এবং জনবিরোধী এক ভয়ঙ্কর নীতি। শিক্ষায় সামগ্রিকভাবে বানিজ্যিকীকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ এবং কেন্দ্রীকরণ—এই হল নয়া শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষাকে মুষ্টিমেয়র হাতে কুক্ষিগত করে রেখে, বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত একদল বেকার মজুত বাহিনী তৈরি করে কর্পোরেট স্বার্থকে বজায় রাখার পাশাপাশি হিন্দুত্ববাদের "হিন্দু রাষ্ট্র" গঠনের কর্মসূচী রূপায়নের স্বার্থে প্রশ্নহীন ও অনুগত একদল মানুষ তৈরি করাই যার মূল লক্ষ্য। আগামী প্রজন্মের স্বার্থেই এই 'শিক্ষানীতি ২০২০'-কে আস্তাকুড়েতে ফেলার দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের, এই প্রজন্মের মানুষদের। □

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

আশু জরুরি কাজ

হবে। যেন ছাত্র সমাজের একটাই কাজ—তা হল অধ্যায়ন করা। ছাত্রদের শিক্ষার জন্য অর্থের যোগান দিচ্ছে তার অভিভাবক। অভিভাবকের যদি মহার্ঘভাতা বকেয়া থাকে বা মালিক শ্রেণির স্বার্থে কাজ চলে গিয়ে থাকে তবু সে ব্যাপারে ছাত্রের ভাবনা করা ঠিক হবে না, কারণ সমস্যাটি যেন শুধু অভিভাবকের ছাত্রদের নয়!

শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত ছাত্র সমাজের একাংশ রাজনীতি করবে না অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থায় পাঁচ বছরান্তে ভোট দেওয়া (সেই অধিকারও আজ আক্রান্ত) ছাড়া তাদের কোনো ভূমিকা থাকবে না। সমাজের এই বিপুল অংশকে বাদ দিয়ে সমাজের একাংশ যারা সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করে রাষ্ট্রকে নিজস্বার্থে ব্যবহার করে আর কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি পেশাদার কিছু রাজনৈতিক জীব এরাই হবেন রাজনীতির একমাত্র অধিকারী!

সরকারী কর্মচারী হলে 'রাজনীতি থেকে দূরে থাকুন' এই ধারণা সৃষ্টি পুরাণ বা মনুসংহিতার নির্দেশমতো না হলেও এই ব্যবস্থার একটা রাজনৈতিক পটভূমি আছে। প্রাক্ স্বাধীনতাকালে পরাধীন দেশকে দ্বিমুখী শোষণের দ্বারা নিজ দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা—একদিকে ব্রিটিশদের নিজেদের শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ, অপরদিকে সস্তায় শ্রমের মাধ্যমে উৎপন্ন পণ্যের বাজারজাত করা। এই সমগ্র শোষণ ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করার প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়েছিল শাসনতান্ত্রিক কাঠামো। স্বভাবতই এই কাঠামোর সাথে জনগণের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এহেন শাসনযন্ত্রে কর্মচারীদের অধিকারের প্রশ্ন অবান্তর, শোষণমূলক শাসন-কাঠামোর সেবা করাই ছিল তাদের একমাত্র কাজ। যেহেতু জনকল্যাণ ও শাসনযন্ত্রের মধ্যে স্ব-বিরোধিতা বর্তমান, সুতরাং কর্মচারী ও জনগণের সম্পর্কেও সেই মৌলিক বিরোধমুক্ত হতে পারে না।

কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর জনকল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে কিছু পরিবর্তন ঘটলেও শাসন কাঠামো অপরিবর্তীত রয়ে গেল। ফলে এক নতুন দ্বন্দ্বের উদ্ভব হল—রাষ্ট্রের লক্ষ্য ঘোষিত হল শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা, কিন্তু সরকারি প্রশাসনযন্ত্রে কর্মীদের শৃঙ্খলার বাধনে আবদ্ধ রাখা। ইংরেজরা শোষণব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখতেই কর্মচারীদের রাজনৈতিক অধিকার দেয়নি, কারণ বৈদেশিক শাসনের রীতিই হচ্ছে এমন কোনো ব্যবস্থা প্রবর্তন না করা যার ফলে নিজের অস্তিত্বই বিপন্ন হতে পারে। তাই ইংরেজ শোষকের স্বার্থেই নিজের পরিবারের লোকের উপর গুপ্তচর বৃত্তির কাজে কর্মচারীদের নিয়োগের বিধান রচিত হয়েছিল। প্রাক্ স্বাধীনতা সময়ে যেহেতু প্রতিটি (তৎকালীন জনসংঘ ছাড়া) রাজনৈতিক দলেরই লক্ষ্য ছিল বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানো, খুব স্বাভাবিকভাবে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী চেয়েছিল কর্মচারীদের রাজনৈতিক দলগুলির প্রভাবমুক্ত রাখতে। সেইজন্যই রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরেও নক্কারজনক সেই বিধান বাতিল করা হল না। ইংরেজ ভারত ত্যাগ করার পরেও 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠায় ব্রতী দেশের সরকার আজ পর্যন্ত সেইসব বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করেনি।

গণতন্ত্রের প্রধান নিয়মই হচ্ছে রাজনৈতিক দলের সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে শাসন ক্ষমতায় আসীন হবার অধিকারকে স্বীকার করা। স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে নিজ পছন্দের রাজনৈতিক দলকে শাসন মতায় নিয়ে আসা। কোনো বিশেষ দলের শাসনকে নিরঙ্কুশ করার জন্য জনসাধারণের কোনো অংশকে রাজনৈতিক অভিমত পোষণ ও সেইমতো কাজ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা গণতন্ত্র বিরোধী। কিন্তু এই চরম অগণতান্ত্রিক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে সরকারী কর্মচারীদের সুস্থ সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে অথচ এই বিধি চালুর মূল কারিগর দেশের সরকারী কর্মচারীরা কিন্তু পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে থাকে।

বর্তমানে সংবিধানে মৌলিক অধিকারের যে স্বীকৃতিটুকু রয়েছে তাও বাতিল করা হচ্ছে শাসকদল ও আমলাতন্ত্রের মর্জিমাফিক রচিত কতকগুলি বিধানকে সংবিধানের উপরে স্থান দিয়ে। এটা আদতে আইনসম্মত কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন করার কৌতূহলকে ক্রমশ ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 'রাজনীতি' বিষয়ে শুধু নিস্পৃহতা নয়, এই কথাটা সম্পর্কে একটা বিরূপতা অবচেতনভাবে মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমনিতেই একটা ধারণা প্রচলিত আছে যেন সরকারী চাকরি পাওয়ার সাথে সাথে রাজনৈতিক অধিকার বর্জন অবশ্যম্ভাবী। এই ধরনের চিন্তাকে পুঁজি করেই শাসকশ্রেণী স্বেচ্ছাচারী বিধান চালু করে। সময় এসেছে এই অধিকার সংক্রান্ত মূলগত প্রশ্ন উত্থাপনের। যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশ পরিচালিত হচ্ছে সেই ফ্রান্স, আমেরিকায় কর্মচারীদের যে অধিকার আছে, আমার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে কেন? সারা ভারতে সরকারী কর্মচারীদের অধিকার সম্পর্কিত এই মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে সজাগ করে ব্যাপক আন্দোলনের পথে অগ্রসর হওয়ার সময় এসেছে। □

টুকরো খবর

অ্যাসোসিয়েশন অফ ডেমোক্রেটিক রিফর্ম সংস্থা দেশের জাতীয় এবং আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী বন্ডে টাকা তোলার তথ্য প্রকাশ করেছে। এক রিপোর্টে তারা জানিয়েছে, ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ এই ছয় বছরে সাতটি জাতীয় দল এবং ৩১টি আঞ্চলিক দল নির্বাচনী বন্ডে মোট টাকা তুলেছে যথাক্রমে ১৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকা এবং ৩ হাজার ২৪৬ কোটি টাকা। এই রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন কমিশনের কাছে নির্বাচনী বন্ডে অর্থ সংগ্রহের যে হিসাব পেশ করেছে সেই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এই রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে জাতীয় শাসক দল বিজেপির যে অর্থ সংগ্রহ হয় তার ৫২ শতাংশ আসে নির্বাচনী বন্ডে। টাকার অঙ্কে ৫ হাজার ২৭১ কোটি টাকা। এরপরের স্থান প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের। নির্বাচনী বন্ডে এদের সংগ্রহ ৯৫২.২৯ কোটি টাকা, দলের মোট অর্থসংগ্রহের ৬০ শতাংশ। তৃতীয় স্থানে রয়েছে আঞ্চলিক দল তৃণমূল কংগ্রেস। নির্বাচনী বন্ডে এদের সংগ্রহ ৭৬৭.৮৮ কোটি টাকা, যা তাদের মোট অর্থসংগ্রহের ৯৩ শতাংশ। আঞ্চলিক দলগুলোর মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসই নির্বাচনী বন্ডে সবচেয়ে বেশি টাকা তুলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সিপিআই(এম) দল নির্বাচনী বন্ড থেকে কোনো অর্থ সংগ্রহ করেনা। □

ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্গত ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনাল অফ পেনশনার্স অ্যান্ড রিটায়ারিজ-এর এশিয়া রিজিওনাল দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ১ অক্টোবর কেরালার তিরুবনন্তপুরমে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ও কেরালা সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী এম এ বেবি। নয়া উদারনীতির সুযোগে গোটা দুনিয়ায় যেভাবে শ্রমজীবী মানুষের ওপর কর্পোরেট, বহুজাতিক কোম্পানিগুলির আক্রমণ নেমে আসছে, তার উল্লেখ করে এম এ বেবি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, এই আক্রমণের বাইরে নন অবসরপ্রাপ্ত মানুষ এবং পেনশনভোগীরা। এদেশের দক্ষিণপন্থী সরকারের নীতির ফলে শ্রমজীবী মানুষ কিভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন, তা তুলে ধরে এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান রাখা হয়। সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন সংগঠন থেকে ৩৬ জন এবং নেপাল ও শ্রীলঙ্কা থেকে ৩ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন ৬ জন। ১৯ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে পেনশনার্স কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে উত্তম পাল এবং ফেডারেশন অফ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পেনশনার্স অরগানাইজেশান (পূর্বাঞ্চল)-এর পক্ষে নিখিলেশ মিত্র। □

ইজরায়েলি সংস্থা এনএসও'র তৈরি পেগাসাস ব্যবহার করে আড়ি পাতা হয়েছিলো দেশের বিরোধী নেতা, সমাজকর্মী এবং সাংবাদিকদের মোবাইলে। দু'বছর আগে এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। এর রেশ কাটতে না কাটতেই আবার দেশের বিরোধী নেতা ও সাংবাদিকদের বেশ কয়েকজনের আইফোন হ্যাক করার চেষ্টার অভিযোগ সামনে এসেছে। আইফোনের নির্মাতা সংস্থা অ্যাপল নিজেই তাঁদের আই-ফোনে "রাষ্ট্রের উদ্যোগে হ্যাকিং"-এর সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে। যাঁরা এই সতর্কবার্তা পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন প্রধান বিরোধী দলগুলির নেতৃত্ব, বিরোধী সাংসদ এবং বিভিন্ন নিউজ পোর্টালের সাংবাদিক। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা এবং সাংবাদিকেরা অ্যাপল সংস্থা থেকে এই সতর্কবার্তা পেয়ে সামাজিক মাধ্যমে তা প্রকাশ করে নিজেদের ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। বিরোধী দলগুলির মধ্যে সিপিআই(এম) দলের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরী প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে এই ঘটনায় একইসঙ্গে ক্ষোভ এবং উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। □

চারদিনের দুর্গাপুজায় ক্লাবগুলোর বিদ্যুৎ বিলে বিপুল ছাড়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। অথচ বিদ্যুৎ খরচ না করেও কৃষকদের কাছ থেকে বিলে বিপুল টাকা আয়ের ব্যবস্থা করেছে সরকার। ২০২৩-২৪ সালের বিদ্যুৎ মাশুল কার্যকর করতে গিয়ে ঘুরপথে বৃদ্ধি করা হয়েছে গ্রাহকদের ফিক্সড চার্জ এবং মিনিমাম চার্জ। ফলে প্রতি মাসে বিদ্যুৎ বিলে বাড়তি বোঝা বহন করতে হচ্ছে রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির গ্রাহকদের। একইসাথে বাড়তি বোঝা চেপেছে কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের সাথে যুক্ত লক্ষাধিক গ্রাহকদের। মিনিমাম চার্জের মধ্য দিয়ে তিনগুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে মাশুল, যে মিনিমাম চার্জ এতদিন পর্যন্ত কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে নেওয়া হত না। কৃষি ক্ষেত্রে প্রতিমাসে কেভিএ পিছু ৭৫ টাকা আদায় শুরু হয়েছে বিদ্যুৎ বিলে। একদিকে কৃষি উপকরণের দাম প্রতিদিন বাড়ছে, সেই তুলনায় ফসলের দাম পাওয়া যাচ্ছেনা। এরসাথে যুক্ত হচ্ছে বিদ্যুতের বাড়তি মাশুল। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই স্মার্ট মিটারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এরমধ্যেই ঘুরপথে মাশুল বাড়িয়ে বিপদ আরও বাড়িয়ে দিতে তৎপর রাজ্য সরকার। □

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার দেশে অর্থনীতির বিকাশে বেকারি কমেছে বলে দাবী করলেও বিশ্বব্যাংক তাদের রিপোর্টে সেই দাবী সরাসরি খারিজ করে দিয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্ক তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে ভারতের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বেকারির হার উদ্বেগজনক ভাবে বেড়েছে। প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান, বাংলাদেশ কিংবা ভুটানের থেকেও ভারতে এই হার বেশি। ২০২২ সালে এই দেশে তরুণদের মধ্যে বেকারির হার ২৩.২২ শতাংশ। এইসময়ে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এই হার ১১.৩ এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ১২.৯ শতাংশ। এই রিপোর্টে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সকেই তরুণ প্রজন্ম হিসেবে ধরা হয়েছে। বিশ্বব্যাংক আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের সূত্রে এই বেকারির হার নিয়ে সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতায় এসেই বছরে ২কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বিশ্বব্যাংকের এই সমীক্ষা রিপোর্ট এই প্রতিশ্রুতির অসাড়তাই প্রমাণ করে। □

গত বিধানসভা নির্বাচনের পর গত দুবছরে রাজ্যে রেশন কার্ড কমেছে প্রায় ১ কোটি ৬৬ লক্ষ। এর একটি বড়ো অংশের মাধ্যমে চাল, আটা, গম লুট করেছে রাজ্যের শাসকদলের মদতপুষ্ট রেশন দুর্নীতিচক্র। এইসময়ে উত্তর ২৪ পরগণায় কার্ড কমেছে ১২ লক্ষের বেশি। সংলগ্ন দক্ষিণ ২৪ পরগণায় কমেছে ১৫ লক্ষের বেশি। যে জেলায় রেশন দুর্নীতির এফ আই আর হয়েছিল, সেই নদীয়ায় কমেছে প্রায় ৮ লক্ষ কার্ড। প্রতি জেলাতেই রেশন কার্ডের সংখ্যা কমেছে এমনকি রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতার জেলা পূর্ব মেদিনীপুরেও ৬ লক্ষ কার্ড কমেছে। বাতিল হওয়া কার্ডের বেশির ভাগই আরকেএসওয়াই-১,২ প্রকল্পের কার্ড। এই কার্ডগুলোর ভিত্তিতে চাল, আটা তোলা হয়েছে দীর্ঘদিন। প্রতিবছরে এর পরিমাণ প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা। এই বিপুল টাকার এক বড়ো অংশই লুট হয়েছে বলে অভিযোগ। □

বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনালে আয়োজক ভারতকে সাত উইকেটে হারিয়ে ষষ্ঠবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হল অস্ট্রেলিয়া। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং—ক্রিকেটের তিন বিভাগেই নিখুঁত পরিকল্পনার ছাপ রেখে টানা দশ ম্যাচে জয়ী ভারতীয় দলকে পরাস্ত করল প্যাট কামিন্সের নেতৃত্বাধীন অস্ট্রেলিয়া। ফাইনালে ১২০ বলে ১৩৭ রান করে দলকে বিশ্বজয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন ট্রেভিস হেড। ফাইনালে পরাজিত হলেও টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন ভারতের বিরাট কোহলি। এছাড়াও ভারতের পেস বোলার মহম্মদ শামি এই টুর্নামেন্টে ভারতের টানা দশ ম্যাচে জয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন। বিশ্বক্রিকেটের আঙিনায় অপেক্ষাকৃত নবাগত দেশ আফগানিস্তান এই বিশ্বকাপে পাকিস্তান, ইংল্যান্ডের মতো শক্তিশালী দলকে পরাজিত করে ক্রিকেট বিশ্বকে চমকে দিয়েছে। □

বঞ্চিত যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের অবস্থান বিক্ষোভ গত ৯ ডিসেম্বর এক হাজার দিনে পড়লো। এতদিন ধরে যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের এই বিক্ষোভ চললেও দু'একবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর তরফে আশ্বাসবাণী কিংবা শাসকদলের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতাদের শুকনো আশ্বাসবাণী ছাড়া সরকারের তরফে কোনো সহায়তাই মেলেনি তাঁদের, মেলেনি চাকরি। উল্টে জুটেছে সরকারের পুলিশের নির্যাতন। ইতিমধ্যেই আদালতের নির্দেশে হওয়া তদন্তে নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী সহ শিক্ষা দপ্তরের একাধিক আধিকারিক জেলে, জেলে শাসকদলের একাধিক বিধায়ক। ১০০০ দিন ধরে চলা অবস্থানের পরেও উদাসীন সরকারের বিরুদ্ধে তাঁদের আন্দোলন আরও তীব্র করার ঘোষণা করেন অবস্থানরত চাকুরীপ্রার্থীরা। সরকারের উদাসীনতার প্রতিবাদ জানিয়ে নিজেদের মাথা ন্যাড়া করে বিক্ষোভ দেখান দুই যোগ্য চাকরিপ্রার্থী। এই আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে এদিন লেনিন মূর্তির পাদদেশ থেকে মিছিল করে গান্ধীমূর্তির নিচে চাকুরীপ্রার্থীদের অবস্থানস্থলে যান বিভিন্ন বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ, শিক্ষানুরাগী, সমাজের বিশিষ্ট মানুষজন সহ অসংখ্য সাধারণ মানুষ। চাকুরীপ্রার্থীদের এই আন্দোলনের প্রতি তাঁরা পূর্ণ সমর্থন জানান। □

বিদেশ থেকে আরও অর্থ নেওয়ার জন্য রামমন্দির ট্রাস্টকে অনুমোদন কেন্দ্রীয় সরকারের। সম্প্রতি শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক জানিয়েছিলেন যে এপর্যন্ত মন্দির নির্মাণে ৯০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে এবং ট্রাস্টের হাতে আরও ৩০০০ কোটি টাকা আছে। এরপরও বিদেশ থেকে অর্থ নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল ট্রাস্টের তরফে। "ফরেন কন্ট্রিবিউশান রেগুলেশন অ্যাক্ট" বা এফসিআরএ-এর আওতায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে সেই অনুমোদন মিলেছে বলে জানান ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যেই প্রায় ৪০০০ কোটি টাকা তুলে ফেলেছে ট্রাস্ট। পরিকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য আরও হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করছে কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকার। এরপরও আরও টাকা কেন? এই প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে। উঠছে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগও। একদিকে যেমন কেন্দ্রীয় সরকার মন্দির নির্মাণের জন্য এফসিআরএ-এর আওতায় বিদেশ থেকে অর্থ আনার অনুমোদন দিচ্ছে, অপরদিকে একই অ্যাক্টের অনুমোদন বাতিল করছে মহিলা, শিশু, আদিবাসী, লিঙ্গসাম্য নিয়ে কাজ করা হাজার হাজার সংস্থা তথা এনজিও সহ বহু সংস্থার। যার মধ্যে রয়েছে মাদার টেরেজার মিশনারি অফ চ্যারিটি, অক্সফ্যাম ইন্ডিয়া, জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ(সিপিআর)- এর মতো সংস্থা। □

শোক সংবাদ

অনিল চাকী

কর্মচারী আন্দোলনের প্রাক্তন নেতৃত্ব এবং অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার কর্মচারীদের সাথে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সংগ্রাম ও সংগঠন গড়ে তোলার অন্যতম কারিগর অনিল চাকী গত ১৭/১২/২০২৩ রবিবার মেদিনীপুর জেলার নিজের বাসভবনে প্রয়াত হন।

অনিল চাকী ২০০২ সালে অবসর নেওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির সাথে যুক্ত হন। মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত তিনি বামপন্থী আন্দোলনের সাথে নিজেকে সংযুক্ত করে রেখেছিলেন। ৬০-এর দশক থেকে কর্মচারী সংগঠকদের সাথে যুক্ত হয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারী সমিতি (W.B.M.O.A) এবং পরবর্তীকালে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির একজন দক্ষ নেতৃত্ব হয়ে ওঠেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি (W.B.M.O.A) জেলা সম্পাদক সহ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সম্পাদক এবং ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন। '৭০-এর দশকে তিনি বাম গণতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে দৃঢ় অবস্থান নেন। তিনি অকৃতদার ও অবিবাহিত ছিলেন। দাদার পরিবারের সাথে বসবাস করে গুরুদায়িত্ব পালন করেন এবং সেখানে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি ০৬/০৬/১৯৪২ বর্তমানে বাংলাদেশের যশোর জেলার কলরা গ্রামে নরাইল মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালে মাতাকে হারান এবং পিতা নিরুদ্দেশ হওয়ায় পরিচিত ঠাকুরমার কাছে মানুষ হন এবং শিক্ষা ১৯৫৬ সালে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯৬১ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আইন পাশ করেন। পরবর্তীকালে ভারতের উড়িষ্যার কটকে ১৯৬২ সালে গেঞ্জী কারখানায় কাজ করেন। কিছুদিন পরে মেদিনীপুরে চলে আসেন এবং সদর হাসপাতালে কিপার হিসাবে অস্থায়ীভাবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ঐ হাসপাতালেই করনিক পদে স্থায়ীভাবে যোগদান করেন। সি এম ও এইচ দপ্তরে হেড ক্লার্কড হন। গত ৩০/৬/২০০২ চাকরি থেকে অবসর নেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রয়োজনে তাঁর দেহ দান করা ছিল। সেই অনুসারেই মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে তাঁর দেহ তুলে দেন পরিবারের লোকজন। □

শ্রীলা মজুমদার

ক্যান্সারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই শেষে প্রয়াত মৃণাল সেনের মানস কন্যা শ্রীলা মজুমদার। মৃত্যুকালীন বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। অবস্থার অবনতি নভেম্বরে। ১৩ থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত টাটা মেডিকেল ক্যানসার সেন্টারে ভর্তি ছিলেন অভিনেত্রী। বছর তিনেকের বেশি সময় ধরে ক্যানসারে ভুগছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন একজন ভারতীয় বলিষ্ঠ চলচ্চিত্র অভিনেত্রী। ১৯৭৯ সালে মৃণাল সেনের 'পরশুরাম' ছবির মাধ্যমে অভিনয় জগতে পা রাখেন তিনি। তিনি শ্যাম বেনেগাল, প্রকাশ ঝা-র মতো চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সাথে একাধিক চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন। ২০০৩ সালে তিনি 'চোখের বালি' চলচ্চিত্রের ঐশ্বারিয়া রাইয়ের জন্য তার হয়ে বাংলায় কণ্ঠ দিয়েছিলেন। তিনি বলিউডি তারকা শাবানা আজমি, নাসিরুদ্দিন শাহ, স্মিতা পাতিল সহ স্বনামধন্য অভিনয় শিল্পীর সাথে অভিনয় করেছিলেন।

শ্রীলা মজুমদারের জন্ম ১৯৫৯ সালের ২৭শে জুন কলকাতায়। রামচন্দ্র মজুমদার ও ননী মজুমদারের কন্যা শ্রীলা অশ্বিনী দত্ত মেমোরিয়াল স্কুলে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে প্রাইভেটে উচ্চ-মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হন। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে ১৯৮০ সালে তিনি স্নাতক হন। তাঁর স্বামী বিশিষ্ট সাংবাদিক এস. এন. আবদি ও পুত্র সোহেল আবদি বর্তমান। □

সুনীলবরণ চক্রবর্তী

কর্মচারী আন্দোলনের প্রাক্তন নেতৃত্ব সুনীল বরণ চক্রবর্তীর জীবনাবসান হয়েছে। গত ২-১-২৪ মঙ্গলবার খড়দহের এক বেসরকারী হাসপাতালে তিনি প্রয়াত হন। বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন যুগ্ম সম্পাদক সুনীল চক্রবর্তীর জন্ম ১৯৩৫ সালে অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুরে। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর কিছুদিন শিক্ষকতা করেন জামসেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে। এরপর সরকারী কর্মী হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় বোর্ড অব রেভিনিউয়ে। চাকরী জীবন শুরু থেকেই নিজস্ব সমিতি সহ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির লড়াই-আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের কোষাধ্যক্ষ হন তিনি। অবসরগ্রহণের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারী পেনসনার্স সমিতির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে বিভিন্ন আন্দোলনের সাথে সক্রিয় ছিলেন।

কর্মজীবনে দক্ষ প্রশাসক হিসাবে তাঁর পরিচিত ছিল। কর্মচারী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে 'কিছু কথা কিছু প্রশ্ন' নামে একটি বইও লিখেছেন তিনি। তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ এবং বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। সুনীল চক্রবর্তীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব সহ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃবৃন্দরা। চিকিৎসা বিজ্ঞানে সাহায্য করার জন্য তাঁর মরদেহ ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে দান করা হয়। □

সুকান্ত চৌধুরী

সমিতি সম্মেলন

সমিতি সম্মেলন

সমিতি সম্মেলন

কৃষিকারিগরী **কর্মী সংস্থার** ৫২তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বিগত ২৩-২৪ ডিসেম্বর ২০২৩ কমরেড সমর রায় নগর-এ (মালদহ শহর), কমরেড শান্তিনাথ মুখার্জী মঞ্চ (মালদহ টাউন হল)-এ। সম্মেলনের প্রাক্কালে ২২ ডিসেম্বর লাল পতাকায় সুসজ্জিত এক দৃপ্ত মিছিল মালদহ শহর পরিক্রমা করে সম্মেলন স্থল মালদহ টাউন হলে উপস্থিত হয়। রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে প্রগতিশীল পুস্তক বিপনন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। পরবর্তীতে পুস্তক পাঠের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সম্মেলন মঞ্চে একটি সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থার সহ সভাপতি চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক রুদ্রকান্ত ভট্টাচার্য, পরবর্তীতে বর্তমান পরিস্থিতিতে পুস্তক পাঠের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন ৫২তম রাজ্য সম্মেলনের বুক স্টলের উদ্বোধক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। একই সঙ্গে ৫২তম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত সমিতির মুখপত্র 'আন্দোলনের অরুণিম' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠন পরিবেশিত হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মালদহের ঐতিহ্যবাহী 'গম্ভীরা'।

২৩ ডিসেম্বর রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে রাজ্য সম্মেলনের প্রারম্ভিক সূচনা হয়। রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সভাপতি অমিতাভ সাহা। শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন সভাপতি অমিতাভ সাহা, অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি প্রণব দাস, মহতী ৫২তম রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধক রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি মানস দাস, সমিতির সাধারণ সম্পাদক রুদ্রকান্ত ভট্টাচার্য, অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি হিমাংশু দে, জেলা ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক দ্বয় সুবীর দে ও শশাঙ্ক শেখর মণ্ডল, সমিতির যুগ্ম সম্পাদকদ্বয় প্রশান্ত চন্দ ও অতনু দাশগুপ্ত, সমিতির মুখপত্র 'আন্দোলনের অরুণিম'-এর সম্পাদক সহ সমিতির জেলা সম্পাদকগণ, বিভিন্ন ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠনের উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক অলোক সরকার।

সম্মেলন পরিচালনা করেন অমিতাভ সাহা, চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী ও রিনাবালা সরকারকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। ৫২তম রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধক রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি মানস দাস অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন, একই সঙ্গে ৫২টি লালবাতি জ্বালিয়ে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। উদ্বোধনী সমাবেশে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি প্রণব দাস ও জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সুবীর রায়। উদ্বোধনী সমাবেশের শুরুতে গণসঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

প্রতিনিধি অধিবেশনের শুরুতে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক অতনু দাশগুপ্ত। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ মানস দাস। পরবর্তীতে কৃষিক্ষেত্রের সঙ্কট, শ্রম আইন সংস্কার, নারীদের ওপর আক্রমণ, জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ, সোশ্যাল মিডিয়াকে সাংগঠনিক প্রচারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার, অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ, দেশের খনিজ সম্পদ কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া, বিজ্ঞানমনস্কতার স্বপক্ষে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল, হয়রানীমূলক নীতিহীন বদলীরোধ সহ ১৪টি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থনে বক্তব্য পেশ করা হয়। ১০টি সর্বভারতীয় দাবি, ১২টি রাজ্য স্তরের দাবি ও ১২টি বিভাগীয় দাবি উত্থাপন ও সমর্থনে বক্তব্য পেশ করা হয়।

সম্মেলনে উপস্থিত ৪জন মহিলা সহ ২১২ জন প্রতিনিধির মধ্যে ২০টি জেলার পক্ষ থেকে একজন মহিলা প্রতিনিধি সহ ২২ জন সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও খসড়া প্রস্তাবাবলীকে সমৃদ্ধ করে আলোচনা করেন। সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি, ভ্রাতৃপ্রতীম প্রতিনিধি ও অতিথিদের সামনে বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি হিমাংশু দে ও অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক অলক সরকার। সম্মেলনে প্রতিনিধি পরিচিতি বিষয়ক তথ্য পেশ করেন দেবাশীষ রায়। উপস্থিত সম্মেলন প্রতিনিধিদের সামনে সমগ্র আলোচনাকে সূত্রায়িত করে জবাবী বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক রুদ্রকান্ত ভট্টাচার্য। সমগ্র আলোচনা সহ জবাবী বক্তব্য সমর্থিত হওয়ার পরবর্তীতে আগামী কমিটির প্রস্তাবনা পেশ করেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক রুদ্রকান্ত ভট্টাচার্য। সম্মেলন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে ২৩ জনের সম্পাদকমণ্ডলী ও ৬২ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়। মানস দাস সভাপতি, রুদ্রকান্ত ভট্টাচার্য সাধারণ সম্পাদক, অতনু দাশগুপ্ত ও অমিতাভ সাহা যুগ্ম সম্পাদক, মনোজ সাহা দপ্তর সম্পাদক, জয় নিয়োগী কোষাধ্যক্ষ এবং সৌমেন্দ্র চক্রবর্তী পত্রিকা সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। □

পশ্চিমবঙ্গ **গ্রামীণ ভূমি সংস্কার কর্মচারী সমিতির** ৪৪তম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন গত ৬-৭ জানুয়ারি, ২০২৪ কমরেড রণজিৎ কুমার মিশ্র নগর, কমরেড সুশান্ত কান্তি বিশ্বাস মঞ্চে (কর্মচারী ভবন, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর) অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলন শুরুতে গ্রামীন ভূমি সংস্কার দপ্তরের প্রায় শতাধিক কর্মচারী তমলুক শহর এলাকায় একটি ট্যাবলো সহ মিছিল করেন। এরপর পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি, বিশিষ্ট আইনজীবী শঙ্কর কুমার কারক দেশের সংবিধান, গণতন্ত্র, বাক স্বাধীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখার লড়াই জারি রাখার আহ্বান জানিয়ে ভাষণ দেন। সম্মেলন উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমান কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আশিষ ভট্টাচার্য। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সমীর ভট্টাচার্য নামাঙ্কিত প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র উদ্বোধন এবং আলোচনা সভা হয়। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা নন্দিনী মুখার্জী। আলোচনার বিষয় ছিল 'বর্তমান ভারতে বিজ্ঞান প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ'। দুই দিনে পুস্তক বিপনন কেন্দ্রে প্রায় ১৫,০০০ টাকার পুস্তক বিক্রয় হয়। সম্মেলনে প্রতিবেদন পাঠ করেন সংগঠনের যুগ্ম-সম্পাদক সুব্রত ব্যানার্জী। এরপর আয়-ব্যয়ের হিসাব ও বিভিন্ন প্রস্তাব সম্মেলনে পেশ হয়। আয়-ব্যয়ের হিসাব করেন করেন ভবানী প্রসাদ দাস।

দু'দিনের এই সম্মেলনে বেশ কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। যেগুলির মধ্যে রয়েছে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার দাবিতে, মিডিয়ার জনবিরোধী ভূমিকার প্রতিবাদে এবং সোশ্যাল মিডিয়ার পরিমিত ব্যবহারের সপক্ষে, চুক্তির মাধ্যমে নিয়োগের বিরুদ্ধে বেকারদের চাকরী ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা সহ শিল্পায়নের দাবিতে নারীর মর্যাদা রক্ষা, বকেয়া মহার্ঘভাতা সহ অর্জিত অধিকার রক্ষার দাবিতে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারী আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং কর্মবন্ধুদের চতুর্থ শ্রেণী (গ্রুপ-ডি)-র কর্মচারী পদে উন্নীত করার দাবিতে, প্রস্তাবাবলী পেশ করেন শেখ হাসমত আলি এবং বক্তব্য রাখেন বিশ্বেন্দু সিংহ। এইদিনই সন্ধ্যায় সম্মেলন মঞ্চে এক আলোচনা সভা হয়। বিষয়বস্তু—লোকসভা নিবাচনের অভিমুখ ও আমাদের করনীয়। আলোচক ছিলেন সংগঠনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক অশোক পাত্র।

এই সম্মেলন পরিচালনা করেন প্রলয় সেনগুপ্ত, দেবাশিষ সরকার, দীপক ব্যানার্জী ও শেখ নূর আলমকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। এই সম্মেলনের সমাপ্তির দিনে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক তথা অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি রাকিবুর রহমান।

জবাবী ভাষণ দেন সংগঠনের যুগ্ম-সম্পাদক সুব্রত ব্যানার্জী। দু'দিনের এই সম্মেলনে ১৪৮ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে ১৯ জন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন থেকে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কমিটির গঠন করা হয়। সভাপতি প্রলয় সেনগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক অতনু মিত্র, যুগ্ম-সম্পাদক সুব্রত ব্যানার্জী ও ভবানী প্রসাদ দাস এবং দীপক ব্যানার্জী কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন। □

বিগত ২০-২১ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির (কলকাতায়) কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনে অনুষ্ঠিত হল **ওয়েস্টবেঙ্গল রেজিস্ট্রেশন এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের** ৩৭তম রাজ্য সম্মেলন। এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ও সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারশনের সহসভাপতি সুতপা হাজরা। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্গত এই সংগঠনের দু'দিনব্যাপী এই রাজ্য সম্মেলনের, সম্মেলন স্থলের নামকরণ হয় কমরেড সমীর ভট্টাচার্য নগর ও কমরেড হামিদ হোসেন মঞ্চ। সম্মেলন স্থলে শনিবার প্রয়াত কমরেড নারায়ণ চন্দ্র মিশ্র প্রগতিশীল পুস্তক বিপনন উদ্বোধন করেন ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সুমিত ভট্টাচার্য। প্রধান অতিথি উপস্থিত উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ শ্যামল চক্রবর্তী। সম্মেলনে ২২,৮০০ টাকার পুস্তক বিক্রি হয়। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সংলগ্ন এলাকায় লালঝণ্ডায় সাজিয়ে তোলা হয়।

সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক নবেন্দু ভট্টাচার্য। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৫ জন মহিলা প্রতিনিধি সহ মোট ৮৪ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন ১৪ জন প্রতিনিধি। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি দেবশঙ্কর সিন্‌হা। সম্মেলন থেকে আগামী কার্যকালের জন্য ৪৭ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। **সভাপতি** মিহির জানা, **সাধারণ সম্পাদক** সুজাউদ্দিন আহমেদ ও **কোষাধ্যক্ষ** হাবিবুর রহমানকে নিয়ে গঠিত হয় সমিতির ১৮ জনের শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী। দু'দিনের এই সম্মেলন পরিচালনা করেন সুব্রত বিশ্বাস, প্রবীর চক্রবর্তী ও মিহির জানাকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। □

আক্রান্ত সংবিধান ও দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক বৃহত্তর পরিসর গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে শেষ হল **পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেকটরেট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের** ৪৬তম রাজ্য সম্মেলন। সরকারী কর্মচারীদের প্রতি উত্তরোত্তর আক্রমণ, হয়রানিমূলক বদলী ও বঞ্চনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনকে ভাঙার চক্রান্তকে রুখেই তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার শপথ নেওয়া হয় ৪৬তম রাজ্য সম্মেলনের মঞ্চে।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনে ২৭-২৮ জানুয়ারী, ২০২৪ পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেকটরেট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের ৪৬তম রাজ্য সম্মেলন কমরেড অমিয় রঞ্জন চক্রবর্তী সভাকক্ষ ও কমরেড অজন্তা চ্যাটার্জী মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের শুরুতে কমরেড তিমির রঞ্জন মুখার্জী নামাঙ্কিত প্রগতিশীল পুস্তক বিপণণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন সমিতির প্রবীণ নেতৃত্ব ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সভাপতি আশিস ভট্টাচার্য। ২০,০০০ টাকার বই উপস্থিত প্রতিনিধিরা ক্রয় করেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য দেবলা মুখার্জী। কর্মচারীদের হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ রাজ্যব্যাপী সংগঠনের 'অধিকার যাত্রা' সফল করার আহ্বান জানান।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সংগঠনের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক ভাস্কর ভট্টাচার্য। প্রতিবেদনের উপর ২২ জবাবী ভাষণ দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক শিলাদিত্য মোহরার।

সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ দেন অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান দীপঙ্কর বাগচী। আগামী কার্যকালের জন্য সম্মেলন থেকে সভাপতি ভাস্কর ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক শিলাদিত্য মোহরার, যুগ্ম সম্পাদক কল্লোল কার্ফা ও সন্দীপ দত্ত, দপ্তর সম্পাদক মিতুল দাস, কোষাধ্যক্ষ প্রশান্ত ঘোষ নির্বাচিত হন।

সমিতির মুখপত্র 'শরিক'-র চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন অর্পিতা ঘোষ। সম্মেলন পরিচালনা করেন শাশ্বতবন্ধু মুখার্জী, আশিস মিত্র, তরুন দত্ত ও সীমা করকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। □

বৃহত্তর আন্দোলনের দিশা স্থির হল **ওয়েস্টবেঙ্গল নন-মেডিক্যাল টেকনিকাল এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের** ২৮তম রাজ্য সম্মেলন। বিভিন্ন দাবি দাওয়া, সরকারের কর্মচারী বিরোধী নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নিয়ে সম্মেলন শেষে ফিরে গেলেন প্রতিনিধিরা।

ওয়েস্টবেঙ্গল নন-মেডিক্যাল টেকনিক্যাল এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের দু'দিন ব্যাপী ২৮তম রাজ্য সম্মেলন শেষ হল রবিবার ২৮ জানুয়ারি '২৪ পূর্ব মেদিনুপুরের তমলুকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা দপ্তরে (কর্মচারী ভবনে)। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহ সম্পাদক শাশ্বতী মজুমদার। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত সম্মেলনে উপস্থিত ৬৬ জন প্রতিনিধির মধ্যে দু'দিন ধরে ১ জন মহিলা সহ ১৮ জন প্রতিনিধি সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। সম্মেলনে প্রতিনিধিদের আলোচনায় উঠে এসেছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১১ মার্চ ২০২৪ কোচবিহার থেকে সাগর পর্যন্ত 'অধিকার যাত্রা' কর্মসূচীকে সফল করে তুলতে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক প্রচার ও ব্যাপক অংশের কর্মচারী বন্ধুকে সমবেত করতে হবে।

সম্মেলনের শুরুতে শতাধিক কর্মচারীদের উপস্থিতিতে বর্ণাঢ্য মিছিল তমলুক শহর এলাকায় পরিক্রমা করে সম্মেলন মঞ্চের (কর্মচারী ভবন) শেষ হয়। পরে পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। স্বাগত ভাষণ দেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. অরুণ মিত্র। ২৬ জানুয়ারি এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে জগদীশ দাস নামাঙ্কিত প্রগতিশীল সাহিত্য বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন শিক্ষক আন্দোলনের নেতা রানা ভট্টাচার্য। এই বুক স্টল থেকে প্রায় ১৮,০০০ টাকার বই বিক্রি হয়। দু'দিনের সম্মেলন পরিচালনা করেন রমেন মণ্ডল, মানস কুমার বড়ুয়া এবং অরবিন্দ সরকারকে নিয়ে গঠিত সভামপতিমণ্ডলী। এই সম্মেলনে অবসরপ্রাপ্ত দু'জন নেতৃত্বকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন পেশ করেন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক শক্তিপদ জানা, আয় ও ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ ছোটন চক্রবর্তী। জবাবী ভাষণ দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বাপ্পা দাস। সম্মেলন থেকে সভাপতি মলয়কান্তি রায়, সাধারণ সম্পাদক বাপ্পা দাস, যুগ্ম সম্পাদক শক্তিপদ জানা, ও কোষাধ্যক্ষ ছোটন চক্রবর্তী নির্বাচিত হন। □

গত ১৩-১৪ জানুয়ারি ২০২৪ মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে **পশ্চিমবঙ্গ সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতির** ৬৪-৬৫তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশাসনের প্রতিহিংসামূলক আচরণের যোগ্য জবাব দিয়ে বর্ণাঢ্য মিছিলের মধ্য দিয়ে বহরমপুর শহরের দীর্ঘপথ মিছিল করে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ সম্মেলন মঞ্চে সমবেত হন। সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন সভাপতি কিংশুক বিশ্বাস। সম্মেলন মঞ্চের নাম করা হয় কমরেড অভিজিৎ দাশগুপ্তের নামে এবং শহরের নামকরণ করা হয় কমরেড বাসন্তী দাশগুপ্তের নামে। রাজ্য সম্মেলনের শুরুতেই বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি তথা রাজ্যের প্রাক্তন সাংসদ বদরুদ্দোজা খান। রাজ্য সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। জেলা ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষে বক্তব্য রাখেন দুলাল দত্ত। সম্মেলনের আগের দিন প্রগতিশীল পুস্তক বিপনীর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাননীয় আব্দুল কাফি। পুস্তক বিপনী উদ্বোধনের পর প্রগতিশীল পুস্তক সংগ্রহ ও পঠনপাঠনের প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক বিষয়ে তিনি মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। পরবর্তীতে নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হয়।

প্রতিনিধি অধিবেশনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন যুগ্ম সম্পাদক স্নেহাশীষ পাল। আয়-ব্যয় হিসেব পেশ করেন বিশ্বজিৎ কর্মকার। চারটি প্রস্তাব পেশ করা হয়। প্রস্তাবগুলি হল—১। "সংগঠনে নারীদের ভূমিকা" পেশ করেন দেবিকা দে পাল, সমর্থন করেন সীমা দে বিশ্বাস, (২) "বিভাজনের রাজনীতি বন্ধ কর"—পেশ করেন আশীষ নস্কর, সমর্থন করেন রাজদীপ দত্ত। ৩। "মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে"—পেশ করেন কৌশিক ভৌমিক, সমর্থন করেন সৌমেন দত্ত। ৪। "কর্ম বন্ধুদের স্থায়ীকরণের দাবিতে"—পেশ করেন তাপস চক্রবর্তী, সমর্থন করেন স্বরূপ মৈত্র।

প্রতিনিধি অধিবেশনে ২৯ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। সম্মেলনে সমিতির 'মুখপত্র' ভূমিজর বিশেষ সংখ্যা উদ্বোধন

● এগারো পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

চতুর্থ পৃষ্ঠার পরে

ভারতের সমন্বয়ী ঐতিহ্য

সঙ্গীত-সংক্রান্ত ছন্দের সঙ্গে গ্রীক কবিতার ছন্দের ও ল্যাটিন ষড়মাত্রিক কবিতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই সঙ্গীত-সংক্রান্ত ছন্দের রীতিকে 'চৌতালা' বলা হয়। রাজা মান সিংহ টোমারের অনুপ্রেরণাতেই তাঁর দরবারের সঙ্গীতজ্ঞরা 'রাগ' সঙ্গীতের নিয়মকানুন নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করেন। তাঁদের এই গবেষণার কাজ 'মান কৌতূহল' গ্রন্থে সংকলিত হয়। মান সিংহের সঙ্গীতজ্ঞরা ভারতের অন্যান্য রাজ দরবারে 'রাগ' বিষয়ে তাদের ফলাফল প্রচার করেন। বাইজু একজন সঙ্গীতজ্ঞ গুজরাটের বাহাদুর শাহর দরবারে যোগদান করেন। তিনি যে সঙ্গীত রচনা করেন তা তাঁর পৃষ্ঠপোষকের নামে 'বাহাদুরি' বলে উল্লেখ করেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভক্তিমূলক সঙ্গীতের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। কবীর রচিত সঙ্গীত থেকে একটি ধ্রুপদী রীতির উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। এই সঙ্গীত 'কবীরাই' নামে উল্লিখিত। আর একটি বিশেষ ধারা হল 'বৈষ্ণব সঙ্গীত' যা 'বিষ্ণু পদ' বলে পরিচিত। গুরুনানক রচিত স্তবগানেও আর একটি সমন্বয়ী ধারা পাওয়া যায়। তার মুসলমান শিষ্য মারাদোনারও ভক্তিমূলক সঙ্গীতে পারদর্শিতা ছিল। দিল্লীর সুলতানী ও মুঘল শাসকরা সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ধ্রুপদী সঙ্গীতের বিকাশে সুলতান সিকান্দরের বিশেষ অবদান ছিল। তার সময়েই 'লাহজাত-ই সিকন্দরী' নামে সঙ্গীতের বিখ্যাত গ্রন্থ রচিত হয়। উল্লেখ্য এই, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই সুফীরা তাদের সঙ্গীত সভার জন্য ('সামা' বলা হত) হিন্দী কবিতা রচনা করতে শুরু করেন। পরিমার্জিত হিন্দী সঙ্গীতের সঙ্গে পারস্য দেশীয় শিল্প দক্ষতা মিশ্রিত হওয়ায় ভারতীয় 'সুফী সামা' সঙ্গীত গভীরতা লাভ করে ও নতুন রূপ ধারণ করে। স্থানিক ভাষা আয়ত্ত করায় সুফীরা আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ করেন এবং হিন্দু ভক্তদের ভাবনার অংশীদার হন। তার ফলে হিন্দু ভক্ত ও হিন্দু সুফী কবিরা সমস্তরকম গোঁড়ামি, ভণ্ডামি ও নির্বুদ্ধিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তারা ধর্মান্তরিতার পথে না গিয়ে, পরস্পরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করতে এবং বিভিন্ন ধর্মমত উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হন। ইবন আল-আরাবির দর্শনের অনুগামীরাও ধর্মীয় বিরোধ দূর করার জন্য আন্দোলন সংগঠিত করেন। তার কথা এই নিবন্ধে একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ঔপনিবেশিক আমলেও পরিবর্তিত পরিবেশে এই সমন্বয়ী ঐতিহ্যের ধারাটি বহু মনীষী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধাদের ঐকান্তিক প্রয়াসে প্রবহমান থাকে। এই বিষয়ে খুবই সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলছি। উল্লেখ্য এই, ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের এই ধারাটির নানা উপাদান পরিস্ফুট হয়। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যেসব ভাবনা-চিন্তার অগ্রগতি ঘটে তাতে তা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। কবি লালন শাহ এবং অন্যান্য বাউল সাধক ও মরমী কবি রচিত অসংখ্য গান গ্রাম বাংলায় উদার-মানবতাবাদী ভাবধারা প্রচার করে। বাংলার বাইরেও দেধরাজ, পলটু, সাহব প্রমুখ সাধকরা এই ভাবধারাকে পরিপুষ্ট করেন। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন রামমোহন রায়ের সমসাময়িক। মধ্যযুগের সাধকদের মতো তারাও নির্ভীকভাবে ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেন। লোক সংস্কৃতির এই ধারাটির প্রভাবের কথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ লেখেন : "এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরানে-পুরাণে ঝগড়া বাধেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্বরতা। বাংলাদেশের গ্রামের গভীর চিত্তে সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল-কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কি রকম কাজ করে এসেছে। হিন্দু-মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ধর্মীয় চিন্তা এক উচ্চ স্তরে উন্নীত হয়। ধর্মাচর্চার মাধ্যমে কেশব চন্দ্র সেন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়কে পরস্পরের নিকটতর করে এক নতুন মানব পরিবার গঠন করতে প্রয়াসী হন। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব ধর্ম সমন্বয় ও মানবতাবাদের আদর্শ উজ্জীবিত করে মানব সমাজকে এক নতুন পথে চলতে উৎসাহিত করেন। মধ্যযুগের সাধকদের মত তিনিও বলেন, মানুষের সেবা হল ঈশ্বরের সেবা। 'যত্র জীব, তত্র শিব', এই মন্ত্র তো তারই কণ্ঠে উচ্চারিত হয়। তার প্রচারিত 'যত মত তত পথ' তত্ত্ব ধর্মীয় চিন্তায় এক নতুন গতিধারা সৃষ্টি করে। তারই প্রিয়তম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ গুরুর ধর্মচিন্তাকে দেশে ও বিদেশে ব্যাপ্ত করেন। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চিকাগোর ধর্মমহাসভার অধিবেশনে স্বামী বিবেকানন্দ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেন, "সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বারবার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় মগ্ন করিয়াছে। এই সকল ভীষণ পিশাচ যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানব সমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইত"। তিনি গভীর প্রত্যয় ব্যক্ত করে এই কথাও বলেন : "শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার উপর লিখিত হইবে: 'বিবাদ নয়, সহায়তা, বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মত বিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি'।" শ্রী অরবিন্দ সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ ধর্মের সমালোচনা করে বলেন, 'যদি ধর্ম সর্বজনীন না হয়, তা চিরন্তন হতে পারে না। একটি সংকীর্ণ ধর্ম, একটি সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ ধর্ম, একটি স্বতন্ত্র ধর্ম কেবলমাত্র একটি সীমাবদ্ধ সময়ের জন্য এবং একটি সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য টিকে থাকতে পারে'। 'সনাতন ধর্ম' ব্যাখ্যায় শ্রী অরবিন্দ সর্বজনীনতার প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি এই কথাও স্পষ্ট করে বলেন, এই সনাতন ধর্মের ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে কেন, বেদান্ত, গীতা, উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ ও তন্ত্র থাকলেও, তা বাইবেল ও কোরান ধর্মগ্রন্থ অস্বীকার করতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ তার কবিতায়, গানে ও অন্যান্য রচনার মাধ্যমে ধর্ম নির্ভর ঔদার্যবোধের, মানবিকতাবোধের ও যুক্তিশীলতার এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের পথটিকেই প্রশস্ত করেন। কাজী নজরুল ইসলামও এই ধারাটিকে পরিস্ফুট করেন। ঢাকার 'শিখা' গ্রুপ বুদ্ধির মুক্তি-আন্দোলন সংগঠিত করে মুসলিম মননকে নতুন চেতনায় উজ্জীবিত করতে চেষ্টা করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃষক ও আদিবাসী বিদ্রোহের সময়ে যে লোকসংস্কৃতির ধারার উদ্ভব ঘটে তার মধ্যেও সমন্বয়ী উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণের ফলে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ভাবধারাকে অটুট রেখে ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে এক স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনের প্রক্রিয়া এই সমন্বয়ী ঐতিহ্যকে অবলম্বন করেই শক্তি সঞ্চয় করে। শ্রী অরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, খান আবদুল গফ্ফর খান, মানবেন্দ্রনাথ রায়, জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু এবং কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী নেতৃবৃন্দ এই সমন্বয়ী ঐতিহ্যের ভিতের ওপর আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে এক নতুন ভারত গঠন করতে প্রয়াসী হন। ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখা সম্ভব না হলেও স্বাধীন ভারতে যে সংবিধান প্রবর্তিত হয়েছে তা এই ঐতিহ্যেরই ফসল। এই সমন্বয়ী ঐতিহ্যকে যদি আমরা আধুনিক জীবনের উপযোগী করে আরও সমৃদ্ধ করতে পারি তাহলে আগামীদিনে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনা অনুযায়ী এক নতুন বিশ্ব গঠনের কেন্দ্র হবে ভারতবর্ষ। □

এগারো পৃষ্ঠার পরে

সম্মেলন সংবাদ

করেন সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সহ সভাপতি আশীষ বাগচী। ভূমিকা উদ্বোধনের পরে বক্তব্য রাখেন ভূমিজ সম্পাদক বিদ্যুৎ দাস ও আশীষ বাগচী। আশীষ বাগচী ভূমিজ প্রচ্ছদ ও সম্মেলনের মঞ্চ সজ্জার বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করেন। সম্মেলনে প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক সম্বল সাহা, কার্যকরী সভাপতি তথা মুর্শিদাবাদ জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক সঞ্জয় সাহা। ক্রেডেনশিয়াল কমিটির রিপোর্ট পেশ করেন দপ্তর সম্পাদক সোমরাজ চক্রবর্তী, আয়-ব্যয়ের উপর জবাবী ভাষণ দেন বিশ্বজিৎ কর্মকার। প্রতিবেদনের উপর প্রতিনিধিদের আলোচনার উপর জবাবী ভাষণ দেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক শেখর সমাদ্দার।

সম্মেলনে প্রগতিশীল পুস্তক বিপনী থেকে মোট ৭৫,৬০০ টাকার বই বিক্রি হয়েছে। সম্মেলনে উপস্থিত ২৮৬ জন (মহিলা ২৩ জন) প্রতিনিধি সর্বসম্মতিক্রমে ৮৯ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পদাধিকার ও আমন্ত্রিত সহ ২৪ জনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচিত করেন। নতুন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন সৌমেন দত্ত। যুগ্ম-সম্পাদক সোমরাজ চক্রবর্তী, কোষাধ্যক্ষ স্বপন বসাক, দপ্তর সম্পাদক সূর্যনাথ ঘোষ, সভাপতি দিবাকর ধর নির্বাচিত হয়েছেন। সমিতির মুখপত্র 'ভূমিজ' পত্রিকার সম্পাদক বিদ্যুৎ দাস এবং সহযোগী সম্পাদক সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচিত হয়েছেন। □

ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর ২৪তম রাজ্য সম্মেলন গত ডিসেম্বর মাসের ৯ ও ১০ তারিখে আলিপুরদুয়ার জেলার কৃষ্ণপদ মণ্ডল নগর ও বাসুদেব মণ্ডল (ক্লাউড লাইন ভবন) মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও 'সংগ্রামী হাতিয়ার' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক সুমন কান্তি নাগ। ৮ ডিসেম্বর প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন সংগঠনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক গোপাল চন্দ্র পোল্লে। সন্ধ্যায় স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দমকল কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যরাও এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। জেলার স্থানীয় দুই মেধাবী ছাত্রীকে ৭৫০০ টাকা করে মোট ১৫০০০ টাকা পঠন পাঠনের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়।

২৪তম রাজ্য সম্মেলনকে প্রবল প্রশাসনিক বাধাবিপত্তির মধ্যে পড়তে হয়। রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক সভা থাকার জন্য পূর্ব নির্ধারিত অনেক পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা যায়নি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে মিছিলের অনুমতি বাতিল করা হয়। সম্মেলন স্থল থেকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠক ও রাত্রিবাসের জায়গার দূরত্ব ছিল ৫০০ মিটার। কোনোরকম চেন ফ্লাগ, পতাকা, ফেস্টুন কিছুই লাগানো যায়নি। ক্লাউড লাইন ভবন কর্তৃপক্ষের উপর প্রবল চাপ তৈরি করা হয় বুকিং বাতিলের জন্য। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন প্রশাসনের নির্দেশে ক্লাউড লাইন ভবনের বাইরের সুসজ্জিত তোড়নটি খুলে ফেলতে হয়। এতদসত্ত্বেও অভ্যর্থনা কমিটি ও আলিপুরদুয়ার জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির দৃঢ়চেতা মনোভাব ও ঐকান্তিক সহায়তায় আমাদের সম্মেলন সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে।

সম্মেলনের প্রথম দিন (৯ ডিসেম্বর) সম্পাদকীয় প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সমিতির যুগ্ম সম্পাদক শুভ প্রসাদ সেনগুপ্ত। আয় ও ব্যয়ের তথ্য পেশ করেন কেষাধ্যক্ষ জয়ন্ত আঢ্য। খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ করেন রাজকুমার দত্ত, অরূপ দাস, সন্দীপ বিশ্বাস, নির্মাল্য চক্রবর্তী ও স্বরূপ মণ্ডল। প্রতিবেদনের উপর ১৯টি জেলা ও ২টি অঞ্চল থেকে মোট ২১ জন আলোচনা করেন। রাজ্য সম্মেলনের বিশেষ সংখ্যা মুখপত্র প্রকাশ করেন সমিতির প্রাক্তন যুগ্ম সম্পাদক যীশু চন্দ্র দাস। কোষাধ্যক্ষ জয়ন্ত আঢ্য ও সংগঠন সম্পাদক অরূপ দাসকে সংবর্ধিত করেন সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক। সংগঠনের গঠনতন্ত্রের নিয়মানুসারে অফিসার হয়ে যাওয়ার কারণে এই দুইজনকে বিদায় সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন জেলা ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বায়ক ও সি আই টি ইউ-র জেলা সম্পাদক। ক্রেডেনশিয়াল কমিটির রিপোর্ট পেশ করেন সংগঠন সম্পাদক অরূপ দাস ও উপস্থিতির পরিসংখ্যান পেশ করেন মুখপত্র সম্পাদক সন্দীপ বিশ্বাস। সমস্ত প্রতিনিধিদের বক্তব্যকে গুটিয়ে জবাবী বক্তব্য পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক সোমনাথ পোদ্দার। প্রতিবেদনের খসড়া প্রস্তাব ও আয়-ব্যয়ের হিসাবে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সম্মেলন থেকে আগামী দুই বছরের জন্য ৫৭ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি ও ১৫ জনের সম্পাদকমণ্ডলীর নেতৃত্ব নির্বাচিত হন। সভাপতি সোমনাথ পোদ্দার, সাধারণ সম্পাদক শুভ প্রসাদ সেনগুপ্ত, যুগ্ম-সম্পাদক মানিক শংকর মৈত্র, মুখপত্র সম্পাদক অরিত চক্রবর্তী ও কোষাধ্যক্ষ পদে নির্মাল্য চক্রবর্তী নির্বাচিত হন। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের আনুষ্ঠানিক ভাবে পরিচয় করিয়ে দেন উদ্বোধক সুমন কান্তি নাগ। গোটা সম্মেলন পরিচালনা করেন তপন প্রামাণিক, শম্ভুনাথ সেনগুপ্ত ও রঞ্জন কুমার দে-কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে ২৪তম রাজ্য সম্মেলনের সফল পরিসমাপ্তি ঘটে। □

পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন এর ৭৩-৭৪ তম তম বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন উৎসাহ উদ্দীপনার ও সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হল বীরভূম জেলার সিউড়ি শহরের রবীন্দ্র সদনের কমরেড রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় নামাঙ্কিত মঞ্চে এবং কমরেড সমীর ভট্টাচার্য নগরে। দু'দিনব্যাপী এই সম্মেলনের প্রাক্কালে গত ২৬ জানুয়ারি ২০২৪ কমরেড অঞ্জন সেনগুপ্ত নামাঙ্কিত বুক স্টল উদ্বোধন করেন রাজ্য কো অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও সমিতির প্রবীণ নেতা অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মেলন স্থলে অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'ভারতীয় সংবিধান ও বহুত্ববাদী ভারত-ভাবনা' শীর্ষক পুস্তকটি উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি ও সমিতির কেন্দ্রীয় নেতা মানস দাস। এই দিন প্রতিনিধিদের ও পরিবারের সদস্যদের এক বর্ণাঢ্য মিছিল সিউড়ি শহর পরিক্রমা করে। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক মঞ্চে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সদস্যরা "টিনের তলোয়ার" নামক নাটকটি মঞ্চস্থ করেন।

২৭ জানুয়ারি ২০২৪ সকালে সমিতির রক্ত পতাকা উত্তোলন করে সম্মেলনের সূচনা করেন সমিতির সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন সভাপতিসহ সমিতির বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে সমগ্র রাজ্য থেকে আগত প্রতিনিধি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশ্যে স্বাগত ভাষণ দেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক দীক্ষিত সিন্হা। সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য ও প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ।

সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক কল্যাণ দাস। সংগঠনের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন অসীম মন্ডল। সম্মেলনে খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ ও সমর্থন করেন যথাক্রমে অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয় অভিজিৎ দাস ও সুমন ব্যানার্জি। উত্থাপিত প্রতিবেদন ও খসড়া প্রস্তাবাবলীর উপর মোট ৪০ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। সমিতির আগত শতবর্ষ উদযাপনের সূচনাকে কেন্দ্র করে এবারের সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে পরিবারের ৪৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সমিতির ঐতিহ্য অনুযায়ী এই সম্মেলনের দুই দিনে অঞ্জন সেনগুপ্ত নামাঙ্কিত প্রগতিশীল বুক স্টলে প্রায় ১,৪০,০০০ টাকার বই বিক্রি হয়। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে প্রতিনিধিদের আলোচনার সাথে সাথে সংগঠনের আসন্ন শতবর্ষ উদযাপনের প্রস্তাবনা করেন সমিতির নেতা ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র 'সংগ্রামী হাতিয়ার' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক সুমন কান্তি নাগ এবং সমর্থন করেন সমিতির নেতা ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি মানস দাস। সমগ্র আলোচনাকে সুত্রায়ীত করে জবাবী ভাষণ দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মনিশংকর মন্ডল। সম্মেলন থেকে অভিজিৎ দাস সভাপতি, মনিশংকর মন্ডল সাধারণ সম্পাদক, শান্তনু মুখার্জী কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। সংগঠনের মুখপত্র 'সংযোগ'-এর সভাপতি নির্বাচিত হন কল্যাণ দাস। শতবর্ষের দিকে এগিয়ে চলা এই সংগঠনের সম্মেলনে প্রতিনিধিরা যেমন তাদের অর্থনৈতিক এবং অধিকারগত দাবী নিয়ে লড়াই করার শপথ নেন, তেমনি আগামী দিনে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব রক্ষার জানকবুল লড়াইয়ে সামিল হওয়ার এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া 'অধিকার যাত্রা'য় অংশগ্রহণের শপথ নেন। □

সুকান্ত চৌধুরী, আশীষ মিত্র

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

রাজ্য কাউন্সিল সভার আহ্বান

অভ্যন্তরে যুক্ত করতে হবে। জেলা নেতৃত্বদের পরবর্তী জেলায় প্রবেশের আগে পর্যন্ত যুক্ত থাকতে হবে। সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকেও এই অধিকার যাত্রায় যুক্ত হতে হবে।

৭। সর্বভারতীয় জাতীয় কাউন্সিল সভা উপলক্ষে কুপনের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ ও বিজ্ঞাপন দ্রুত কেন্দ্রীয় দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

৮। আগামী ৩০ জানুয়ারি ২০২৪, মহাত্মা গান্ধীর শহীদ দিবসে ১২ই জুলাই কমিটির ডাকে কলকাতায় কেন্দ্রীয়ভাবে বেলেঘাটার গান্ধী ভবন থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত সম্প্রীতি মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। মিছিল শুরু হবে বিকেল ৪.৩০ মিনিটে। এই মিছিলে ব্যাপক জমায়েতের জন্য অন্তর্ভুক্ত সংগঠন ও কলকাতার অঞ্চলগুলোকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিটি জেলা সদরেও ঐদিন সম্প্রীতি মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। এই বিষয় জেলা কমিটিগুলিকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। □

Editor : MANAS KUMAR BARUA | State Co-ordination Committee | Regd. No. : 18484/71
SANGRAMI HATIAR | 51st Year, 7th & 8th Edition, November-December 2023

ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ. বি. রোড)

১৪ তম ত্রি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন সফলভাবে সম্পন্ন

সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে সম্প্রীতির দূর্গ গড়—এই আহ্বানকে সামনে রেখে ৬-৭ জানুয়ারি আগরতলা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হল ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ. বি. রোড)-র চতুর্দশ ত্রি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন। ত্রিপুরার মধ্যবিত্ত শিক্ষক কর্মচারীদের ১২টি সংগঠনের যৌথ আন্দোলনের মঞ্চ ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির এই রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সংগঠনের নেতা কর্মীদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপা। রাজ্য সম্মেলনের পূর্বে সম্পন্ন হয়েছে ২২টি বিভাগীয় কমিটির সম্মেলন। রাজ্য সম্মেলনের প্রধানবক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এ. আই. এস. জি. ই. এফ-এর সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী সংগঠনের প্রয়াত তিন নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সম্মেলন স্থলের নামকরণ করা হয়েছিল কমরেড বিশু কুমার ভৌমিক নগর এবং সম্মেলন মঞ্চের নামকরণ করা হয়েছিল কমরেড ননী দেববর্মা ও কমরেড ক্ষিরোদ দেববর্মা মঞ্চ।

৬ই জানুয়ারী সকাল ১১টায় টাউন হল প্রাঙ্গনে এক প্রকাশ্য সমাবেশের মধ্য দিয়েই শুরু হয়ে রাজ্য সম্মেলন। সংগঠনের চেয়ারম্যান মহুয়া রায়ের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন এ. আই. এস. জি. ই. এফ-র সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার, বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী ও সমন্বয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বপন বল। প্রকাশ্য সমাবেশের পর রাজ্য সম্মেলন

এ. শ্রীকুমার

উপলক্ষে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের চেয়ারম্যান মহুয়া রায়। শহীদ বেদীতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এ. শ্রীকুমার, বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী সহ নেতৃবৃন্দ। শহীদ স্মৃতিতে পালন করা হয় নীরবতা।

টি. ই. সিসি (এইচ. বি রোদ)-র সাংস্কৃতিক শাখা উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে সভাপতিমণ্ডলী, পরিচালকমণ্ডলী, অনুলিখন কমিটি গঠন করে শুরু হয় প্রতিনিধি অধিবেশন। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন সংহিতা সেনগুপ্তা। উদ্বোধন করেন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডঃ ভূপাল সিন্‌হা। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, নয়া শিক্ষানীতি ২০২০-এর ক্ষতিকারক বিষয়গুলি তিনি উদ্বোধনী ভাষণে উল্লেখ করেন। আন্তর্জাতিক, জাতীয়, রাজ্য পরিস্থিতি সহ সাংগঠনিক পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক স্বপন বল, আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন রাজেশ রুদ্রপাল।

প্রধান বক্তার ভাষণে শ্রীকুমার বলেন, ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি ১৯৬৮ সালে জন্মলগ্ন থেকেই সঠিক দিশায় পরিচালিত হয়ে রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীদের একমাত্র প্রধান সংগঠন হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে পেয়েছে। তিনি বলেন, অন্যান্য রাজ্যের কর্মচারীদের সাথে ত্রিপুরার কর্মচারীদের আর্থিক সাহায্যের ফলেই ফরিদাবাদ এ. আই. এস. জি. ই. এফ-এর প্রধান কার্যালয় ‘সুকোমল সেন’ ভবন নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। শ্রীকুমার বলেন, আজ ধান্দার পুঁজিবাদ সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও সম্প্রদায়ের নামে লগ্নিপুঁজি, আর এস এস মানুষকে ট্রেড ইউনিয়নকে ভাগ করতে চাইছে। তিনি বক্তব্যে পেনশন বেসরকারীকরণ সংক্রান্ত নয়া জাতীয় পেনশন স্কীম, চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ, সরকারী কাজে আউটসোর্সিং ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরে ধারাবাহিক সংগ্রামের জারী রাখার আহ্বান জানান। প্রধান অতিথির ভাষণে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী আর এস এস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী জনস্বার্থ বিরোধী নীতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সাধারণ সম্পাদকের পেশ করা প্রতিবেদনের উপর ২২টি বিভাগীয় কমিটি ও সমন্বয় কমিটির অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ আলোচনা করেন। জবাবী ভাষণ দেন স্বপন বল, জনজীবন ও কর্মচারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির উপর ৬টি

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

মৌলিক প্রস্তাব সম্মেলনের উত্থাপিত ও গৃহীত হয়। ৪৯ দফা দাবি সনদ ও ১৮ দফা সাংগঠনিক ও আন্দোলন কর্মসূচী গৃহীত হয়। দাবিসনদ এবং সাংগঠনিক ও আন্দোলন কর্মসূচী পেশ করেন সংগঠনের দু’জন যুগ্ম-সম্পাদক পীযূষ কান্তি দত্ত ও নন্দন দে। মহিলা সাবকমিটির পক্ষে রিপোর্ট পেশ করেন কমিটির আহ্বায়িকা সংহিতা সেনগুপ্তা। ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠনের পক্ষে গভর্নমেন্ট পেনশনার এসোসিয়েশনের ত্রিপুরার সাধারণ সম্পাদক বাদল বৈদ্য, বীমা কর্মচারী সংগঠনের পক্ষে বিকাশ দাস, ত্রিপুরা অটোনোমার্স ও সেবি গভর্নর এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের পক্ষে কার্তিক বণিক ও টি ই সি সি (মহিম সরণি)-র পক্ষে অঞ্জন চৌধুরী সংহতিমূলক আলোচনা করেন। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক সুব্রত গাঙ্গুলী।

সম্মেলন থেকে ৫৮ জনের নতুন

নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক
মহুয়া রায়

কার্যকরী কমিটি ও ২১ জনের সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হয়। নতুন কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে রঞ্জিত রুদ্র পাল, সাধারণ সম্পাদক মহুয়া রায় এবং কোষাধ্যক্ষ হিসাবে রাজেশ রুদ্রপাল নির্বাচিত হন।

সম্মেলন পরিচালনায় সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন মহুয়া রায়, সুচিত্র জমাতিয়া, নমিতা গোপ, বিনয় দাস, শ্যামবাহাদুর দেববর্মা, হিমাদ্রি দেবনাথ, রজতজয় চাকমা ও অঞ্জন রায়চৌধুরী।

সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে সমাপ্তি ভাষণ ও আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে দু’দিন ব্যাপী সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে। □

পীযূষ কান্তি দত্ত, ত্রিপুরা

কোন পথে অধিকার যাত্রা

দাবিসমূহ ঃ □ বিভাজনের রাজনীতিকে পরাস্ত করে রাজ্যে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। □ প্রশাসনের সমস্ত শূন্যপদ স্বচ্ছতার সাথে পূরণ করতে হবে। □ চুক্তিভিত্তিক ও অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ করতে হবে। □ অবিলম্বে বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান করতে হবে।

গ্রাফিক্স ঃ প্রজ্ঞানন্দ চ্যাটার্জী

১৭-০২-২০২৪ ঃ কোচবিহার—সিতাই ঃ
সিতাই, দিনহাটা, কোচবিহার।

১৮-০২-২০২৪ ঃ
কোচবিহার—আলিপুরদুয়ার ঃ
কোচবিহার, খলটা, বীরপাড়া, আলিপুরদুয়ার শহর।

১৯-০২-২০২৪ ঃ
আলিপুরদুয়ার—জলপাইগুড়ি ঃ
আলিপুরদুয়ার, ধূপগুড়ি, গয়ারগাটা, বানরহারট, নাগরাকাটা (শুলকাপাড়া), মেটেলি (চালসা মোড়), মালবাজার।

২০-০২-২০২৪ ঃ
জলপাইগুড়ি—দার্জিলিং ঃ
মালবাজার, গরুবাথান, ওদলাবাড়ি, ক্রান্তি, লাটাগুড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ, ফুলবাড়ি, তিনবাত্তি মোড়, গেটবাজার, শিলিগুড়ি, হাসমিচক।

২১-০২-২০২৪ ঃ
দার্জিলিং—উত্তর দিনাজপুর ঃ
দার্জিলিং মোড়, শিবমন্দির মেডিকেল রোড, ফাঁসিদেওয়া, গোয়ালটুলি, খড়িবাড়ি ব্লক, ঘোষপুকুর, বিধাননগর, গাড়িতে সোনাপুর চোপড়া, ইসলামপুর।

২২-০২-২০২৪ ঃ
উত্তর দিনাজপুর—দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ
ইসলামপুর, ডালখোলা, করনদীঘি, রায়গঞ্জ, কর্নজোড়া, হেমতাবাদ ও কালিয়াগঞ্জ, কুশমন্ডি, বালুরঘাট।

২৩-০২-২০২৪ ঃ
দক্ষিণ দিনাজপুর—মালদা ঃ
বালুরঘাট, তপন, বুনিয়াদপুর, মেহেন্দিপাড়া, ইটাহার, আশাপুর, চাঁচোল, কদুবাড়ি মোড় (গাজোল), পুরনো মালদা মোড়, সুকান্ত মোড়, রাজহোটেল মোড় (মালদা)।

২৪-০২-২০২৪ ঃ মালদা—মুর্শিদাবাদ ঃ
মালদা, রথবাড়ি, কালিয়াচক, ফারাক্কা, রঘুনাথগঞ্জ, লালগোলা, ভগবানগোলা, লালবাগ, বহরমপুর।

২৫-০২-২০২৪ ঃ মুর্শিদাবাদ—বীরভূম ঃ
বহরমপুর, ডোমকল, কান্দি, খড়গ্রাম, মোরগ্রাম, নলহাটি, রামপুরহাট)।

২৬-০২-২০২৪ ঃ বীরভূম ঃ
রামপুরহাট, মহম্মদ বাজার, সিউড়ি।

২৭-০২-২০২৪ ঃ বীরভূম—পূর্ব বর্ধমান ঃ
সিউড়ি, বোলপুর, ভেদিয়া, কাটোয়া, বর্ধমান সদর।

২৮-০২-২০২৪ ঃ
পূর্ব বর্ধমান—পশ্চিম বর্ধমান—বাঁকুড়া ঃ
বর্ধমান সদর, মেমারী-২ ব্লক, কর্মচারী ভবন (বর্ধমান), হুগলী হাইওয়ে, দুর্গাপুর, পানাগড়, কাঁকসা ব্লক, দুর্গাপুর সিটি সেন্টার, ওন্দাল ব্লক, রানিগঞ্জ, আসানসোল, রবীন্দ্র ভবন, দিসের ঘাট, শালতোড়া, ছাতনা, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর।

২৯-০২-২০২৪ ঃ বাঁকুড়া—পুরুলিয়া ঃ
বিষ্ণুপুর, তালডাঙড়া, সিমলা পাল, খাতরা, ইন্দপুর, রঘুনাথপুর।

০১-০৩-২০২৪ ঃ পুরুলিয়া ঃ
রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া ট্যাক্সি স্ট্যান্ড।

০২-০৩-২০২৪ ঃ পুরুলিয়া—ঝাড়গ্রাম ঃ
পুরুলিয়া, বান্দোয়ান, বেলপাহাড়ি ব্লক, শিলদা, ঝাড়গ্রাম।

০৩-০৩-২০২৪ ঃ
ঝাড়গ্রাম—পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ
ঝাড়গ্রাম, ভেদুয়া ব্রিজ, চাঁদরা, রাঙামাটি, মেদিনীপুর জেলা শাসক দপ্তর।

০৪-০৩-২০২৪ ঃ
পশ্চিম মেদিনীপুর—পূর্ব মেদিনীপুর ঃ
মেদিনীপুর, খড়্গপুর মহকুমা শাসক দপ্তরের সামনে, বেলদা, এগরা, কাঁথি, তমলুক।

০৫-০৩-২০২৪ ঃ পূর্ব মেদিনীপুর ঃ
তমলুক, কোলাঘাট, বাগনান, উলুবেড়িয়া।

০৬-০৩-২০২৪ ঃ হাওড়া—হুগলী ঃ
উলুবেড়িয়া, হুগলী, ডিহিবাদপুর, পুরশুরা, আরামবাগ শহর, সিঙ্গুর থানা, চুঁচুড়া।

০৭-০৩-২০২৪ ঃ হুগলী—নদীয়া ঃ
চুঁচুড়া, চন্দননগর, খাদিনা মোড়, ঘড়ির মোড়, পান্ডুয়া, কালনা, কাটোয়া, গৌরাঙ্গ সেতু, করিমপুর, তেহট্ট, পলাশী পাড়া, দেবগ্রাম, নাকাশীপাড়া, কৃষ্ণনগর কালেকটরেট)।

০৮-০৩-২০২৪ ঃ
নদীয়া—উত্তর ২৪ পরগনা ঃ
কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, চাকদহ, কল্যানী, হালিশহর, নৈহাটি, ব্যারাকপুর এস ডি ও অফিস, ব্যারাকপুর স্টেশন, বারাসাত, বারাসাত ডি. এম. অফিস।

০৯-০৩-২০২৪ ঃ
উত্তর ২৪ পরগনা—দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ
বারাসাত, কামালগাজী, আমতলা, ডায়মন্ড হারবার রোড, ফতেপুর মোড, সরিষা হাট, ডায়মন্ড হারবার, লালপোল মোড়, ডায়মন্ড হারবার সমিতি দপ্তর।

১০-০৩-২০২৪ ঃ
দক্ষিণ ২৪ পরগনা—৮বি বাস স্ট্যান্ড ঃ
ডায়মন্ড হারবার সমিতি মোড়, ডায়মন্ড হারবার এস. ডি. ও অফিস, কুলপি মোড়, বিজয়গঞ্জ বাজার, বারুইপুর পদ্মপুকুর মোড়, গড়িয়া মোড় থেকে অধিকার যাত্রার সমাপ্তি মিছিল ৮বি বাস স্ট্যান্ড। **(সমাপ্তি সভা)**

*** ১০-০৩-২০২৪ সকল নেতৃত্ব কর্মী, কর্মচারীকে গড়িয়া মোড় থেকে ৮-বি বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত মিছিলে যুক্ত হতে হবে। মিছিল শুরুর সম্ভাব্য সময় বিকাল ৪.৩০ মিনিট।**

*** ১৪-৩-২০২৪ যৌথ মঞ্চের আহ্বানে হাওড়া রেল মিউজিয়াম (বেলা ১টায় জমায়েত) থেকে নবান্ন অভিযান কর্মসূচী।** □

সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
সহযোগী সম্পাদক ঃ সুমন কান্তি নাগ
যোগাযোগ ঃ
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।